KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কল-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : জিতেন্দ্র চক্রবর্তী
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 24 25 26 27/1	Year of Publication : বর্ষ সংখ্যা ১৩৮৩ Apr - Sep 1977 Apr - Sep 1978 Apr - Jun 1979
	Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : জিতেন্দ্র চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতাকেন্দ্রিক সাহিত্যপত্র

অন্যদিন

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদক
শিশির ভট্টাচার্য

সংকলন
২৫
১৩৮৪

প্রকাশিত হল

অন্যদিনের কবিতা

সত্তর দশকে লেখা কবিতার সংকলন

গত দশ বছরের মধ্যে রচিত শতাধিক প্রবীণ ও নবীন কবির কবিতা এই সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। একটা কালের কাহিনী এ'কে বলা যেতে পারে। কবিতার ভাষা, কবিতার আঙ্গিক, কবিতার রূপকলা কীভাবে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে—এ'তে তার স্বাক্ষর পাওয়া যাবে।

শিশির ভট্টাচার্য সম্পাদিত

দামঃ ৭·৫০

অন্যদিন ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা-৪৫

TAPAS BHARAI
87/5, Seven Tanks Estate
COSS.PC Rd CLUB
CALCUTTA-700002

অন্যদিন

অবৈতনিক সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ জীবন সরকার

অন্যদিন প্রধানত তরুণ গোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক কবিতাকেন্দ্রিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী গল্প, কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা খাম পাঠাবেন।

*

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫ ফোন ৪৬-৩৭১৪।

*

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কল'কাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস ঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কল'কাতা-৯।

*

দাম ঃ তিন টাকা

গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা ১৩৮৪
সংকলন ২৫

অন্যদিন

প্রবন্ধ

কৃষ্ণ ধর
চন্দ্রশেখর রায়

গল্প

জীবন সরকার
শৈলেন চৌধুরী

কবিতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত * অমিতাভ দাশগুপ্ত * অরুণাভ দাশগুপ্ত * অখিল দত্ত * অন্নদাশংকর রায় * অমিতাভ চৌধুরী * অপরাজিতা গোপী * অমল ভৌমিক * আনন্দ বাগচী * আনওয়ার আহমদ * অতীন্দ্রিয় পাঠক * ইন্দ্রজিৎ বসু * ওয়াজেদ আলি * কমল সাহা * কবিতা সিংহ * কবিরুল ইসলাম * কুমারেশ চক্রবর্তী * কার্তিক মোদক * কৃষ্ণ ধর * গোপাল ভৌমিক * গৌরাঙ্গ ভৌমিক * গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় * গিরিধারী কুণ্ডু * জগন্নাথ চক্রবর্তী * জয়ন্ত চক্রবর্তী * জীবনময় দত্ত * জীবন সরকার * তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল * তারাপদ রায় * তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় * দিনেশ দাস * দীপক কর * দিব্যেন্দু পালিত * নচিকেতা ভরদ্বাজ * নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী * নির্মল বসাক * পলাশ মিত্র * পবিত্র মুখোপাধ্যায় * প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত * প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় * প্রণব মাইতি * প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ * প্রশান্ত রায় * প্রেমেন্দ্র মিত্র * বিষ্ণু দে * বিজয়া মুখোপাধ্যায় * বিনয় মজুমদার * বিল্বব চন্দ * বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * বীরেন মিত্র * বুদ্ধদেব বসু * বাণিক রায় * বাসুদেব দেব * বিনোদ বেরা * বেবী আনওয়ার * মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় * মঞ্জুষ দাশগুপ্ত * মণীন্দ্র গুপ্ত * মণীন্দ্র রায় * মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় * রণজিৎ দেব * রত্নেশ্বর হাজরা * রবীন সুর * রাম বসু * লোকনাথ ভট্টাচার্য * শংকর দাশগুপ্ত * শঙ্খ ঘোষ * শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় * শান্তনু দাস * শক্তি চট্টোপাধ্যায় * শিবশম্ভু পাল * শিশির ভট্টাচার্য * শিপ্রা ঘোষ * সত্য গুহ * সমরেন্দ্র

সেনগুপ্ত * সমরেন্দ্র দাস * সন্তোষকুমার অধিকারী * সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় * সাধনা মুখোপাধ্যায় * সিদ্ধেশ্বর সেন * সুজাতা প্রিয়ংবদা * সুচেতা মিত্র * সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় * সুনীল হাজরা * সুনীল কুমার নন্দী * সুশীল রায় * সুভাষ মুখোপাধ্যায় * স্নেহাকর ভট্টাচার্য * সৈয়দ কওসর জামাল * সৌমেন বন্দোপাধ্যায় * স্বদেশরঞ্জন দত্ত * হরপ্রসাদ মিত্র।

বিদেশী কবিতা

নেপালী

মাধব প্রসাদ ঘিমিরে
অনুবাদ ঃ হরেন ঘোষ

আমেরিকা

ওয়ালেস স্টিভেনসন
অনুবাদ ঃ অভিজিৎ সিরাজ

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

মারাঠী

নামদেব ধাসাল
অনুবাদ ঃ দিব্যেন্দু মিত্র

পাঞ্জাবী

সোহন শিং
অনুবাদ ঃ সুমর জোয়ারদার

আলোচনা

কংকন নন্দী
চিত্রভানু সরকার

কবি-পরিচিতি

বর্ধমান

কবিতার খবর
শোক সংবাদ

সম্পাদকের কথা

'অন্যদিন'-এর এটি পঁচিশতম সংখ্যা। বয়সের হিসেবে সাত বছরে পা দিয়েছে আমাদের এই কবিতা পত্রিকা। একটি কবিতাভিত্তিক সাহিত্য পত্রিকার বয়স হিসাবে সাত-সাতটা বছর নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয় নিশ্চয়ই। অন্তত আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে। আর এই সাত বছরের যাত্রাপথে 'অন্যদিন' যে অজস্র পাঠক-পাঠিকা, কবি, গল্পকার, প্রবন্ধ লেখক, সাহিত্য-সমালোচক এবং অন্যান্য সাহিত্যপিপাসু মনের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাণী কুড়িয়েছে তা গৌরবের সঙ্গেই উল্লেখ করা চলে। সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে অসংখ্য তরুণ কবি ও লেখক 'অন্যদিন'কে নিজের পত্রিকা বলেই মনে করেন। কারণ, এই পত্রিকা কোন বিশিষ্ট গোষ্ঠী বা দলের মুখপত্র হিসেবে নিজেকে পরিচিত না ক'রে সর্বজনের জন্যই মুক্তদ্বার। অগণিত তরুণ ও নবীন কবি 'অন্যদিন'-এর মাধ্যমেই প্রথম পরিচিতির স্বাক্ষর রেখেছেন এবং প্রতিষ্ঠা লাভও করেছেন অনেকে।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে আমরা বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি কোনদিকে তা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করার জন্য বর্তমান সংখ্যা 'অন্যদিন'-এ এ যাবৎ প্রকাশিত অজস্র কবিতা থেকে প্রায় শ'খানেকের মত কবিতা চয়ন করলাম। এই কয় বছরে সমগ্রভাবে কবিতার রূপ ও রীতির কিংবা ভাব-ভঙ্গী ও ঢঙের কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা আশা করি তাঁরা তা সহজেই বুঝতে পারবেন।

কবিতা তো বহতা নদীর মত। নদীর গতির সঙ্গে কবিতার গতির মিল পাই আমরা। নদী যেমন বাঁকে বাঁকে চেহারা পাল্টায় কবিতাও তাই। কবিতার চেহারা পাল্টায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। যদিও তার মূল চরিত্র বদলায় না। সার্থক কবিতা সর্বকালেই সার্থক, সর্বকালেই কবিতা। কবিতায় তাই

কোন আধুনিকতা নেই। আজ যা আধুনিক আগামীকাল তা-ই পুরাতন হয়ে যায়। 'সাম্প্রতিক' এই অর্থে যদি 'আধুনিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয় তবে অবশ্য অন্যকথা। কবিতা হচ্ছে জীবনের ও জীবন ধারণের প্রতিধ্বনি বা প্রতিচ্ছবি। যুগে যুগে জীবনের হালচাল বদলায় ভাষার বদল হয় এবং কবিতায় তা প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। রাজনীতি বা সমাজনীতির প্রভাব তো কবিতায় অবশ্যই পড়ে কিন্তু ঐ সব তত্ত্ব নিয়ে যে শ্লোগান রচিত হয় তাও কবিতা কিনা এ প্রশ্নের অধিকার উত্তরকালের সাহিত্যের ছাত্র দাবী করতেই পারেন।

আমরা এখানে যে-সব রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশ করলাম তা নির্বাচন করার সময় এই সব কথা মনে রেখেই অগ্রসর হয়েছি।

তরুণ বা প্রবীণ সব কবিদের কবিতা আমরা কবির নামের আদ্যাক্ষরের বর্ণানুক্রম অনুসরণ করে যথাসম্ভব সজ্জিত করেছি। এছাড়া নূতন কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধও এই সংখ্যায় যথারীতি মুদ্রিত হল। আশা করি ভালো লাগবে সবারই।

শিশির ভট্টাচার্য

বাংলাদেশ ঃ জীবনানন্দের ক্যামেরায়

কৃষ্ণ ধর

তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব—রূপসী বাংলার আরম্ভটা এই রকম। বাংলাভাষী কবিমাত্রেই কখনো না কখনো বাংলার মাটি ধুলো ঘাস, তার জলে আকৃষ্ট হয়েছে। জীবনানন্দর আকর্ষণ একেবারে অবিরল। অথচ প্রেমের কবি তিনি নন। বাংলার নিসর্গ তাকে আকৃষ্ট করেছে। ইতিহাস, সময় আর সকরুণ সাম্প্রতিক বাস্তবতা এক করুণ বিপদে আপ্লুত করেছে কবিকে।

শহর বাতিরেকে যন্ত্রশিল্পাকাতর শিল্পকর্ম হয়তো তৈরী হত না। আধুনিক নাগরিক অস্তিত্বের বেদনাই কবিকে বার বার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে বাংলার গ্রামে। সে এক আশ্চর্য আবিষ্কার ও আত্মমগ্নতার চিত্র। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি? কী দেখেন তিনি? ছাতার মতন বড় ডুমুরের পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দয়েল পাখি। শুধু এই? তারও গভীরে চলে যায় স্মৃতি বেহুলার কথা তার মনে পড়ে যায় প্রেমাস্পদের জন্য ছিন্ন খঞ্জনার মতো নেচেছিল সে ইন্দ্রের সভায়। তার দুঃখে বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়। এক মুহূর্তে তিনি নিসর্গকে ইতিহাসের প্রবহমান স্রোতে মিলিয়ে দিয়ে তাকে অবিস্মরণীয় করে তোলেন। শংখমালা চন্দ্রমালা মাণিকমালার কাঁকন বাজত এই বাংলায়, কোনোদিন বাজিবে কি আর? কবির মনে প্রশ্ন জাগে।

এক একটি কবিতায় এক একটি ছবি। কথাচিত্র তিনি এঁকেছেন। শিল্পী অনায়াসে তাকে রঙে ও রেখায় রূপ দিতে পারেন! পশমের মতো লাল বটের ফল নীল ঘাসের ওপর ঝরে পড়ে। ঘাটে পাট শুধু পচে অবিরল। ভাসানের গানের কথা মনে পড়ে যায়—চারিদিকে বাংলার ধানী শাড়ি, শাদা শাঁখা, আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীল মঠ।

অতি সাধারণ জিনিসও কবিতায় তার জায়গা করে নেয়—কমলীর ঘ্রাণ, হাঁসের পালক, চাঁদাসরপুটিদের মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত—এইসব আমাদের কাছে যেন স্বপ্ন! কিশোরের পায়ে-দলা মুথা ঘাস—অন্য কোনো কবি কি দেখেছেন এমনভাবে বাংলার গ্রামীন প্রকৃতিকে?—এরই মাঝে বাংলার প্রাণ কবি টের পান।

এই প্রকৃতি ও পরিবেশ রূপসী বাংলার কবিতার সপ্রাণ, সজীব। বাসকের

গন্ধ, আনারস ফুলে ভোমরার ওড়াউড়ি, গুবরে পোকার ক্ষীণ গুণরাজি সব তিনি শোনেন যেহেতু 'ইহারা আমারে ভালোবাসে।'

এই ভালোবাসার একটা গাঢ় বিষণ্ণতা আছে। গভীর এবং প্রায় নিঃশব্দ-কাতর। একটি কিশোরীর ছবি প্রায়শ উপস্থিত হয়েছে এই কবিতাগুচ্ছে সারারাত কিশোরীর লাল পাড় চাঁদে ভাসে হাতের কাঁকন বেজে ওঠে

আঁচলে নাটরে কথা ভুলে গিয়ে বুঝি
কিশোরের মুখ চেয়ে কিশোরী করিবে তার মৃদু মাথা নিচু।

সামান্যই অসামান্য হয়ে ফোটে বাংলার চালচিত্র। পুকুরের ভাঙা ঘাটলায় আজ আর কেউ এসে চাল-ধোয়া হাতে বিনুনি খসায় না। কবির বিষণ্ণ হৃদয়ের উক্তি শুনি 'কড়ি খেলবার ঘর মজে গিয়ে গোখুরার ফাটলে হারায়।' উজ্জ্বলতার চিত্র নয়। কেননা কবি তো জানেনই—

মধুসূদনী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলায় এবার বল্লাল সেন আসিবে না—জানি আমি রায়গুণাকর আসিবে না—

এক আশ্চর্য বিষণ্ণতায় ভরে যায় ছবির সব রঙ
বউ কথা কও আর রাঙা বউটিকে
ডাকে নাকো—হলুদ পাখনা তার কোন যেন কাঠালে পলাশে
হারায়েছে ; বউও উঠানে নেই পড়ে আছে একখানা ঢেঁকি
ধান কে কুটিবে বল—কতদিন সে তো আর কোটে নাকো ধান।

তবু কবির ভালবাসা এই বাংলারই প্রতি—

পৃথিবীর রাঙা রোদ চড়িতেছে আকাঙ্ক্ষায় চিনি চাঁপা গাছে
জানি সে আমার কাছে আছে আজো—আজো সে আমার কাছে আছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর করুণ এই স্থান। এই বাসমতী ধানক্ষেত ছেড়ে তিনি মালাবারে উটির পর্বতে যাবেন না। এখানে বেতের বনের ফাঁকে বাঘিনীর ডোরা দেখা যায়। জারুল গাছের তলায় রোদ পোহায় রূপসী হরিণী। আলোকলতার পাশে শাদা ভাঁট ফুলের তোড়া দ্রোণফুল বাসকের গায়ে ঢেলে দেয় গন্ধ।

এইখানেই তিনি আমাদের নিয়ে যান। শহুরে মানুষকে টেলিলেন্সের ভিতর দিয়ে দেখান সেই অসামান্য ছবি—তলতা বাঁশের ছিপ হাতে মানুষ আনারসের ঝোপে ঐ মাছরাঙা রাঙা লিচুগাছের তলায় মাথা নিচু করে আছে কিশোরী। শালিখ চড়ুই ঘাসে ঘাসে খুঁটে খুঁটে খায়। পরণ কথার গন্ধ লেগে থাকা, বেহুলার কান্না ভেজা, লহনা ফুল্লরার বাংলার সন্ধ্যানম্র পথে অকস্মাৎ যেন তিনি থমকে দাঁড়ান—

'মাঠের আঁধার পথে শিশু কাঁদে'।

কার শিশু? বল তুমি ঃ শুধালাম, উত্তর দিল না কিছু বট ;

কেউ নাই কোনোদিকে মাঠে পথে কুয়াশার ভিড় ;
তোমারে শুধাই কবি ঃ তুমিও কি জান কিছু এই শিশুটির।

তিনি আমাদের শোনান তার কথা। বার বার স্বপ্নাতুর গলায় তিনি শোনান অপরূপ এক রূপকথা—

কেটে গেছে তারপর তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে
ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কতবার কুড়ালাম খড়
বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালবেসে
ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর আর খড় গেল ভেসে
মাথুরের নালা বেঁধে কতবার ফাঁকা জল খড় আর ঘর।

এই উচ্চারণ আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। কবি আমাদের শোনান তার ভালবাসার গভীরতার কথা। দুঃখ-বেদনার মধ্যেও তিনি এখানেই ফিরে আসবেন, ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়—

হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়।

গ্রাম বাংলার প্রতি এইভাবে জীবনানন্দ আমাদের চোখ ফেরান। তাঁর সহৃদয় ক্যামেরায় ধরা ছবি দেখে বাংলাকে বুঝি। শহরের ধুমল হাওয়ায় যা অনেক সময় আচ্ছন্ন হয়ে যায় আমাদের চোখের সামনে থেকে।

তাঁর কবিতায় বেতের দরম ফল, ধুন্দুলের বীজ, নাটাফল যেমন ঘুরে ফিরে আসে তেমনি দেখতে পাই তাঁর এই কবিতাগুচ্ছে গঙ্গা ফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি শ্যামাপোকা ঢের। সবুজ ঘাসের ভিতর শুয়ে থেকে সামনে তুলে ধরেন যে-চিত্র তা শুধু বাংলাদেশেরই—

কোনো এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল
তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে ঃ নরম ব্যাকুল।

তাই কোনখানে পৃথিবীর ব্যস্ততা সফলতা শক্তির ভিতর কিংবা কোনখানে আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট জেগে উঠছে, তা নিয়ে কবির মাথাব্যথা নেই। বাংলার পাড়াগাঁয়ে তিনি থাকেন, থাকতে চান আবহমানকাল ঃ বুইচির বনে জোনাকির রূপ দেখে তিনি কাতর ; কদমের ডালে লক্ষ্মীপেচা নিশুতি জ্যোৎস্না রাতে গান গায়। টুপ্ টুপ্ টুপ্ সারারাত শিশির ঝরে।

বার বার এই বাংলার ঘাস আর ধুলোতেই তার যাওয়া আসা ঃ

এই পাড়াগাঁর
পথে তবু তিনশো বছর আগে হয়তো বা—আমি তার সাথে
কাটায়েছি ; পাঁচশো বছর আগে হয়তো বা সাতশো বছর।

কবি করুণানিধান ঃ কাব্য-প্রতিমার খড়-মাটি

চন্দ্রশেখর রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত যে-সব কবিরা জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, মোটামুটি ভাবে তাঁরা প্রত্যেকেই দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ভারতের নবজাগরণের আলোকে লালিত-পালিত হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁরা পেয়েছিলেন হাতের মুঠোয়। ফলে মধুসূদনের কাব্যের পাশে হেম-নবীন জায়গা পেয়েছেন মর্যাদার সঙ্গে। এমন কি ভারতচন্দ্রের ঢঙে কাব্য রচনার প্রয়াসও তখন নিন্দনীয় ছিল না। কালিদাসের কাব্য-সুষমা তখনকার কবি-মানসকে যতখানি প্রভাবিত করতে পারত, বৈষ্ণব-সাহিত্য যতখানি অন্তরঙ্গ হ'তে পেরেছিল, ঠিক সেই পরিমাণে পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্য এই সব কবিদের আকর্ষণ করতে পারে নি। যাঁরা অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রশিষ্য ব'লে পরিচিত কবি, তাঁদের কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাব ছাড়াও এই সব নিদর্শনগুলো অল্পবিস্তর ছড়িয়ে আছে।

বিশেষ ক'রে করুণানিধানের কবি-মানসের পটভূমি গড়ে উঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের আদর্শে। বাল্যকাল থেকে সংস্কৃত কাব্যের আলো-বাতাসে তিনি বড় হ'য়েছেন।[১] চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব কাব্যানুরাগ তাঁকে মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধানত হ'তে শিখিয়েছে। মধ্যবয়সে রচিত 'শান্তিপুর' কবিতাটি কৃত্রিম উচ্ছ্বাস প্রকাশের মাধ্যম মোটেই নয়।[২] রবীন্দ্রনাথের কাব্য মাধুর্য তাঁকে বাঙলা ভাষার প্রতি অনুরাগী ক'রে তুলেছে। পরম আত্মীয় (সম্পর্কিত ভাগিনেয়) অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজের অবিচার করুণানিধানকে যেমন সামাজিক সংকীর্ণতাকে ধিক্কার দিতে শিখিয়েছে,[৩] তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, অতুলচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের কৃতিত্ব ভারতের মহিমাকে জাগরূক ক'রেছে তাঁর মনে। 'বঙ্গমঙ্গল'এ এই শ্রদ্ধা ও ধিক্কার অতি প্রকটভাবে ছড়িয়ে আছে। 'প্রসাদী' থেকে তাঁর কবিতা অন্য দিগন্তের দিকে পদযাত্রা শুরু ক'রেছে মিথ্যা নয়। এর পেছনে কিছু ঐতিহাসিক কারণও আছে।[৪] তিনি শিল্পবোধের কাছে বশ্যতা স্বীকার করাই যথার্থ মনে ক'রেছেন। কিন্তু পরম ভক্তের মতো 'বঙ্গমঙ্গল'এ তিনি যেমন আদর্শের কাছে নতজানু হ'য়েছেন, এই ভঙ্গীটি সেই 'গীতারঞ্জন' পর্যন্ত

অক্ষুণ্ণ। অনেক সময় মনে হয়, করুণানিধানের ব্যক্তি-চরিত্রের সঙ্গে কাব্য-চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। প্রচারবিমুখ ব্যক্তিজীবনের প্রভাব পড়েছে তাঁর কাব্যেও। তাই তাঁর কবিতা কখনো উচ্চকণ্ঠ হতে চায় নি।

বর্তমান কাব্য-সাহিত্যে ক্লাসিক ভাবধারার প্রয়োজন আছে কিনা, ঐতিহ্যবাদ কতখানি গ্রহণযোগ্য, এ প্রশ্নের মধ্যে তর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু বাঙলা কাব্যের ইতিহাসের অনেকখানি অংশ জুড়ে শাশ্বত ভাবধারা ও ঐতিহ্য প্রীতি ছড়িয়ে আছে। এবং এ দু'টি চিহ্নের নজির না রাখতে পারলে সেদিন কোন রচনাই সাহিত্য পদবাচ্য ব'লে গণ্য হ'ত না। এই মানসিকতার আরাধনা চলেছে অনেক দিন। তারপর, একটা রঙের সঙ্গে আর-এক রঙের মিলন ঘটলে যেমন ক'রে পূর্ব বর্ণ হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে সাহিত্যের ধর্ম পালটে গেছে। আজকের কবি-সাহিত্যিকদের কাছে 'শাশ্বত' শব্দটা নিতান্তই অলীক।[৫] বিশ্লেষণের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালে, অথবা আধ্যাত্মিকতায় লীন হ'তে পারলে জগতের সব কিছুই 'মায়া' ও 'অশাশ্বত'। কিন্তু শিল্পীরা মায়াবাদকে সমর্থন করবেন কেন? জানি না, আজকের স্বল্পখ্যাত কোন কবি বা গল্পকার যখন প্রাণের তাগিদে কিছু রচনা করেন, তখন তিনি ভাবতে পারেন কিনা, আগামীকাল এর কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর যত্ন ও প্রয়াস উত্তরকালের পাঠক-সমীপে পেঁছুতেই পারবে না। জানি না, শিল্পীরা নিজের সম্বন্ধে এতখানি অনীহা পোষণ করেন কিনা! নাকি, এটা নিজেদেরকে ছলনা করার প্রচেষ্টা?

তবে, কাব্য কতখানি শাশ্বত হবে, আর কতখানিই বা ঐতিহ্য-নির্ভর, এ প্রশ্ন সত্যই জটিল। একদিন এই জটিলতাই প্রকট ক'রে তুলেছিল রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রর মতবিরোধ। আপাতদৃষ্টিতে সে-বিরোধ লজ্জাজনক হ'লেও দুই বিদগ্ধ কবিকে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড় করিয়েছিল ওই জটিল প্রশ্নটি—এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সুরেশ সমাজপতির গোঁড়া ঐতিহ্যবাদ, যা বঙ্কিমী-আদর্শে অনুপ্রাণিত, সে-ঐতিহ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন সরে এসে বিশ্বজনীন হ'তে চেয়েছেন, বাঙালিয়ানার আধার যখন তাঁকে আর ধরে রাখতে পারছে না, তখনি সমাজপতি মশাইয়ের ঐতিহ্যে আঘাত লেগেছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের পরবর্তী যুগে, যখন রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ বৈষ্ণবীয় বাঙালি ছিলেন, তখন তাঁর কাব্যে স্বদেশের ঐতিহ্যই সপ্রাণ ছিল। কবিতার ঐতিহ্য-চেতনা ও গদ্য সাহিত্যের ঐতিহ্য চিন্তা সমান নয়। সুরেশ সমাজপতি এই

দুই ভিন্নধর্মী আর্টকে এক আসনে বসাতে চেয়েছিলেন এইখানেই তাঁর বিভ্রান্তি।[৬]

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পর্যায়ের কাব্য-সাধনায় বিহারীলালের আধুনিকতা বহুভাবে প্রভাব ফেলেছে। এবং করুণানিধান যখন কবিতা লেখার চর্চা আরম্ভ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ভীষণভাবে বিহারীলালের রোমান্টিসিজম প্রভাবিত। ফলে, ক্লাসিক ভাবধারা ঐতিহ্যচিন্তা ও বিহারীলাল (বাঙলার পল্লীপ্রীতি)—রবীন্দ্রনাথের (সৌন্দর্য-চেতনা) অনুকূলে প্রভাব এই ত্রি-স্রোতের চিহ্ন সমূহ অবচেতন ভাবে করুণানিধান গ্রহণ করেছিলেন। করুণানিধানের কবিতায় সেই আধুনিকতারই সুর শোনা যায়, যে-আধুনিকতা বিহারীলাল কর্তৃক সূচিত হ'য়েছিল।

'বালক' পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে করুণানিধানের প্রথম পরিচয় ঘটে। পিতা নৃসিংহচন্দ্র ধানবাদের কাছাকাছি গোবিন্দপুর গ্রামে শিক্ষকতা করতেন। সাত বছর বয়সে করুণানিধান পিতার সঙ্গে গোবিন্দপুরে চলে আসেন। পরে কাশীপুরে পঞ্চকোট রাজ ইস্কুলে নৃসিংহচন্দ্র বদলী হন। বালক করুণানিধান এখানকার পার্বত্য পরিবেশ এবং ঠাকুরবাড়ির 'বালক' পত্রিকার মধ্যে নিজের একাকীত্বকে হারিয়ে ফেলতেন। প্রকৃতির অসীম বৈচিত্র্য ও রবীন্দ্র-কবিতার মাধুর্য তাঁর কবি-প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করে। সে অনুপ্রেরণার চরিত্র জানার জন্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনীই যথেষ্ট ঃ

> নূতন পত্রিকার আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে নূতন প্রেরণা আনে। বিচিত্র রচনাসম্ভারে উহাকে[১] অপরূপ করিয়া তোলেন। সব্যসাচী সাহিত্যিক 'বালকের' জন্য গল্প উপন্যাস নাটিকা কবিতা ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বালকদের জন্য লিখিতেছেন বলিয়া কোন রচনার মধ্যে তরলতা বা লঘুতা নাই ; তিনি সাহিত্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মন দিলেন।—
>
> [প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২০]

এই সৌন্দর্য মগ্নতাই করুণানিধানের কবি-প্রেরণার মূল কথা। সমাজ-পরিবেশ-মানুষ-সম্পর্কে অনেক সময় তাঁকে নির্লিপ্ত মনে হ'তে পারে, কিন্তু কবিতা তাঁর কাছে একটি সফল নির্মিতির ব্যাপার। তাঁর স্বভাবের নিহিত শিল্পবোধই হয়ত এনেছে এই নির্লিপ্ততা। এই সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রবণতা।

এই কারণেই তাঁর কবিতা কখনো উচ্চকণ্ঠ নয়। বরং সেই দুরূহ পথই তাঁর কাম্যিত, যা রাতারাতি কবিকে লোকপ্রিয় করে না, সস্তা উল্লাসে সোচ্চার হ'তে চায় না, কিন্তু ভবিষ্যতের পাঠকের জন্যে কিছু উজ্জ্বল প্রাপ্তি রেখে দেয়।[৮]

শীতের পোষাক যেমন উত্তপ্ত পরিবেশে প্রয়োজন হারায়, ভোরের ফুল মধ্যাহ্নে যেমন ম্লান হয়, আজকের কবিতার পাশে ঠিক সেই পরিস্থিতি হ'য়েছে করুণানিধানের কবিতার। করুণানিধান রবীন্দ্রনাথের মতো মহান কবি ছিলেন না, এবং তিরিশের দশকের কাব্য আন্দোলনের অংশীদারও নন। তিনি একটি স্থির বিন্দুর কবি। ব্যক্তি জীবনে দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সহবাস ক'রেছেন, কিন্তু কাব্যে তার প্রতিফলন নেই। সমাজের হীনতা দেখেছেন, তার জন্যে কোন বিক্ষোভ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখার প্রয়োজন করুণানিধানের ছিল না। করুণানিধান সেই রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধন্য হ'য়েছেন, যে-রবীন্দ্রনাথ খেয়া মানসী সোনারতরী নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যে সৌন্দর্য প্রেম ও ঐতিহ্যের আরাধনা ক'রেছেন। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রূপান্তর, যা 'বলাকা' থেকে শুরু ক'রে 'শেষ লেখা'র বিন্দু ছুঁয়েছে, তার সঙ্গে করুণানিধানের মানসিকতার পরিচয় খুবই অল্প। এ কথা শুধু করুণানিধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ কিরণধন, কালিদাস ও কুমুদরঞ্জনের পক্ষেও সত্য। বস্তুত, রবীন্দ্রেতর কবি গোষ্ঠীর কাছে আমরা কোন মতেই সমগ্র রবীন্দ্র-প্রতিভার অনুসরণ প্রত্যাশা করি না। এই সব সমতলবাসী কবিদের চলার ঢঙের সঙ্গে তিরিশের দশকের কবিদের চলার ঢঙের মিলের চেয়ে অমিল হওয়াই স্বাভাবিক। আজকের সমালোচকদের এ সত্যটা ভুললে চলবে না।

---

১. 'কোকিলদূতম্' কাব্য প্রণেতা হরিমোহন প্রামাণি একজন বিশিষ্ট সংস্কৃত কবি ছিলেন। করুণানিধানের মাতুল রামনাথ তর্করত্ন হরিমোহনের স্নেহের পাত্র ছিলেন। 'কমলাকরুণাবিলাস' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক হরিমোহন ও রামনাথ যৌথভাবে রচনা করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই নাটকটির প্রশংসা ক'রে হরিমোহনকে নাটকখানি মুদ্রিত করতে উপদেশ দেন। দীর্ঘকাল পরে হরিমোহনের পুত্র যশোদানন্দন ও করুণানিধানের চেষ্টায় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটি মুদ্রিত হয়। রামনাথের

'বাসুদেব বিজয়' মহাকাব্য পাঠ ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই মন্তব্য করেন : কালিদাসের 'রঘুবংশ' সংস্কৃত সাহিত্যের যে স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইংরাজি সাহিত্যে মিল্টন যেরূপ স্থলে আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, আজ 'বাসুদেব বিজয়'ও সেইরূপ স্থান পাইবার উপযুক্ত ইহাই আমার বিশ্বাস।' [মদনমোহন কুমার রচিত 'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও কাব্য' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।]

রামনাথ সম্বন্ধে মদনমোহন কুমার লিখেছেন : 'রামনাথের বিদ্যা, শাস্ত্র চর্চা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর সপ্তম এডওয়ার্ড Prince of Wales রূপে কলিকাতায় আগমন করেন। ৩রা জানুয়ারী ১৮৭৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এল-এল, ডি, (ডক্টর অফ-ল) উপাধি Prince of Walesকে দেওয়া হয়। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কলিকাতায় বড়লাটের প্রাসাদে যুবরাজের সম্বর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়, পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্ন সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া যুবরাজকে আশীর্বাদ করেন। [ঐ]

২. 'শান্তিপুর' কবিতাটি......রসের বহু বিঘ্ন-কণ্টকিত শ্রুতিতর্পণের দৃষ্টান্ত হ'য়ে উঠেছে।

[—কবি করুণানিধান : হরপ্রসাদ মিত্র। দেশ—৭, ফাল্গুন, ১৩৬১]

৩. অতুলচন্দ্র ছিলেন সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ইংরেজ ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ক'রে (১৮৯৬) প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনিই প্রথম বাঙালী, যিনি বিলাতে ভারতের হাইকমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৫, অক্টোবর লণ্ডনে The Times পত্রিকা দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে অতুলচন্দ্রের এই কৃতিত্বের প্রশংসা ক'রে ভারতের যুব-শক্তির প্রতি অসীম আশা পোষণ করেন। কিন্তু এই কৃতী-পুরুষ স্ব-দেশে (শান্তিপুরে) বিলাত যাওয়ার অপরাধে 'একঘরে' হন। তৎকালীন সমাজ অনুরূপ অবিচার ক'রেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিও।

৪. 'বঙ্গমঙ্গল' রচনা কালেই করুণানিধান বিহারীলালের কাব্য লালিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'প্রবেশ' কবিতায় তিনি এই অনুরাগের স্বীকৃতি ব্যক্ত করেছেন। প্রাক্ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে জাতীয় জাগরণের যে-উন্মাদনা তাঁর ছিল, চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের রাজনৈতিক কলহে সে-উন্মাদনা তিনি হারিয়ে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ সালে ২৬, অগ্রহায়ণ রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদীকে লিখেছিলেন,

'উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয়, এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আন্দোলনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।'

করুণানিধান এই রকম পরিকল্পনা বোধকরি রবীন্দ্রনাথের আগেই গ্রহণ করেছিলেন মনে মনে। পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রাখিবন্ধনে করুণানিধান যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, (মদনমোহন কুমারের 'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও কাব্য' ১৩৭ পৃঃ—১৬৭ পৃঃ) তা অন্য উদ্দীপনার কারণ। স্ব-নামে 'বঙ্গমঙ্গলের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল এই উদ্দীপনায়।

৫. আমি অমরত্বে বিশ্বাস করি না। এই সব লেখকদের মধ্যে সকলেই উত্তরকালে সম্মানিত স্বীকৃতি পাবেন কিনা কিংবা মহাকালের আসন-টাসন ছুঁতে পারবেন কিনা—সে সম্পর্কে আমি কিছুমাত্র মাথা ঘামাই নি।

[—আজকের গল্প। সম্পাদকের কথা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়]

৬. কেবল সুরেশচন্দ্রকে দোষ দিয়ে লাভ কী? চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোহিতলালও ত রবীন্দ্র-সমালোচকরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বাঙালীর অগৌরবজনিত কাল্পনিক মানসিকতায়।

৭. 'বালক' পত্রিকা।

৮. আমাদের কালই বিশ্বকাল নয় এবং যুগপ্রভাবিত সমাজচিন্তা বা জীবনচেতনাই সাহিত্য-বিচারের পাথেয় নয়। একথা ঠিক, সূক্ষ্মগভীর কল্পনা অথবা তত্ত্বগভীর দার্শনিকতা করুণানিধানে নেই, কিন্তু তাঁর কবিতাবলী স্বর্গসুন্দর দিব্য পূজারীর শুদ্ধ সারল্যের দীপ্তিই যে বিকিরণ করে—সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহই নেই।

[—বাঙালীর সাহিত্য : অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৩২০]

নিজের আয়না

জীবন সরকার

হরকুমার কাঁচি হাতে নিয়ে ভাবছিল।

বেলা হয়ে গেল, এখনো তো লোকজন আসছে না। এমন তো হয় না। এই সেলুনের বেশ নামডাক আছে।

আজকাল যেন কি হয়েছে। ছুটির দিন ছাড়া খরিদ্দারের ভিড় মোটেই হতে চায় না। কমিশন হিসাবে কাজ। হাত খালি থাকলে চলে? এমনিতেই সংসার যায় যায়। কোন রকমে বেঁচে-বর্তে আছে। বস্তুত দু'চারজন যা আসে—মালিকের হাতেই কাটে। এই বুড়োকে তাদের পছন্দ নয়। মালিকের বয়স কম। টেরিলিন, টেরিকটে ফিটফাট থাকে। মুখে খই ফোটে—অজানা এমন কোন বিষয় নেই। পাশাপাশি হরকুমারকে দেখলে গ্রাম্য গ্রাম্য মনে হয়। সেই পুরোন আমলের সার্ট—ধুতি। আবোল-তাবোল বকতেও পারে না। উঠতি যুবকেরা সেই জন্যেই চুল কাটতে চায় না। ওদের ধারণা সে মডার্ণ কাট-ছাট জানে না। কথাটা মিথ্যা নয়। ক্লীপ, থিন সিজার ব্যবহার করে না। কিন্তু এমন সূক্ষ্মভাবে মিলাবে যা আধুনিক যন্ত্রকেও হার মানায়।

বিভিন্ন রকমের ব্রাস, চিরুনী, পাউডার, স্নো, কোনকালে দেখেনি। কলকাতায় এসে এতবড় সাজান সেলুন দেখল। দেওয়ালের চারপাশে আয়না। ঘোরান চেয়ার। বসার বেঞ্চ। পড়বার জন্য পত্রিকা। রেডিও—এলাহি ব্যাপার।

হরকুমার দেওয়ালের কাঁচে নদীর পাড়ে ঘাট দেখতে পেল। সারি-সারি নৌকা ঘাটে বাঁধা রয়েছে। ব্যস্ত সমস্ত লোকজন ছোটাছুটি করছে।

বটগাছের নীচে বশীকাকা আর বাবা বসতেন। ভাঙচুর টিনের বাক্স, ভাঙাচিরুনি, একটা এলেবেলে কাঁচি, পুরানো ক্ষুর—এই ছিল সম্বল। চুল কাটতে হলে বশীকাকার কাছে যেতে হত। বাবা নিজের হাতে কাটতেন না। বলে দিতেন—চুল ছোট করে ছাটতে তেল যেন গড়িয়ে পড়ে। সে এক ভয়ংকর ব্যাপার। বশীকাকা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে খ্যাচ খ্যাচ কাঁচি চালাতেন। তখন বশীকাকাকে মনে হতো যম। একটু এদিক-ওদিক নড়লেই

গলায় ক্ষুর বসিয়ে দেবে।

সেই বশীকাকা এখনো জীবিত আছে, এই কলকাতা শহরেই। বশীকাকা এখন জাত-ব্যবসা করে না। বাড়ী করেছে। গাড়ী করেছে। ছেলে ভাল ব্যবসা করে। একবার ভেবেছিলাম দেখা করি কিন্তু যাওয়া হয় নি। কে যেন বললে আত্মীয়-স্বজনকে পরিচয় দেয় না। জাতে উঠেছে। এখন তার চাল-চলনও আলাদা। সেইজন্য বশীকাকার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও বিশেষ একটা পছন্দ করে না। নিজের জাত, নিজের দেশ, যে ভুলে যায় সে আবার মানুষ! বৌ বলে অন্য কথা। আজকাল সে যুগ নেই। চালাক হতে হয়। একটা নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না। একবার গিয়ে দেখা কর না। যদি একটা কাজ দেয়।

হরকুমার আয়নার দিকে তাকালেন। চোখ দুটি ঠিকরে পড়ছে। ওপাশ থেকে ক্ষুধার্ত জানোয়ার উঁকি মারছে। নিজের এই গাল ভাঙ্গা টাক মাথা কদাকার মুখ দেখলেই ও রকম মনে হয়।

চোখটা আপনা থেকেই সরিয়ে নেয়।

হন্তদন্ত হয়ে ঝপ্ করে একজন এল, যেন কেউ বন থেকে লাফিয়ে পড়ল, বললে: আপনি পারবেন?

—কেন পারবো না। এই এক্ষুনি করে দিচ্ছি। হরকুমার যেন হাতে স্বর্গ পেল। তাড়াতাড়ি চেয়ারটা ঝেড়ে যন্ত্রপাতিগুলি সামনে রাখল এবং লোকটাকে তেরছাভাবে তাকিয়ে দেখল, একমাথা চুল। দাড়ি ছমাস কাটেনি। ভদ্রলোক এদিক ওদিক করে চারপাশে তাকাল। কিসের যেন গন্ধ শুঁকতে চেষ্টা করল। হরকুমার ভেবে পায় না দীর্ঘদিন চুল না কেটে থাকে কি করে। এই জন্যই দোকানে আজকাল লোকজন হয় না। হরকুমার চেয়ারটা ঝেড়ে বললে—

বসুন!

ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে খুব সন্তর্পণে বসে পড়ল। হরকুমার নিজেকে চাঙ্গা করবার জন্য একটা বিড়ি ধরাল।

আয়নার দিকে মুখ রেখে ধোঁয়া ছেড়ে বোঝাতে চাইল—কে বলেছে আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বৌ-এর কথা সত্য নয়। রাতদিন ঘ্যানর ঘ্যানর করে—বুড়ো মিনশের জন্য হাড়-হাড্ডি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। মুরোদ নেই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাবার, সে আবার কেমনতর বাপ।

—অঃ দাদা।

হরকুমার ধড়মড়িয়ে কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি বিড়িটা নিবিয়ে কানে রাখল। এতক্ষণ যেন সে অন্য জগতে ছিল। এই দোকান, এই চলাচলের রাস্তা কোন কিছুই খেয়াল ছিল না। হরকুমার অস্ফুট উত্তর দিলে—এই, এক্ষুনি করে দিচ্ছি।

মাথাটা সোজা করে ধরল। বস্তুত সেই সময় ছেলের কথা মনে পড়ল। বড় হয়ে কোন সেলুনে গিয়ে বলবে জলদি করুন। অফিসে যাবে। বৌ-এর তাই ইচ্ছা। সেই জন্যেই লেখাপড়া শিখাচ্ছে। কিছুতেই এই কাজ করতে দেবে না। বশীকাকার ছেলের মত করাবে যাতে বাড়ী গাড়ী করতে পারে। কিন্তু তা কি আর হবে!

—এই যে বুড়ো দাদা তাড়াতাড়ি হাত চালান। হরকুমার মুখ ঘুরিয়ে দেখলে কোন জবাব দিল না। ইতিমধ্যে দোকানে দু'চারজন এসেছে। তার মধ্যে থেকেই একজন চেঁচাল।

হরকুমার নিজেকে সোজা করল। বারে বারেই অন্যমনস্ক হলে কাজ করবে কি করে। হাতের যন্ত্র একটু এদিক ওদিক হলে লেগে যেতে পারে। ক্রমশঃ পেটে চিনচিনিয়ে ব্যথা উঠছে নামছে।

কয়েকজন বসে চুটিয়ে গল্প করছে। রাজনীতি বায়স্কোপ। এ পাড়ার মেয়ে ও পাড়ার ছেলে কি সব যা তা করছে।

বিশ্রী ব্যাপার। হরকুমার ভাবে কেউ কি আধঘণ্টা চুপ করে থাকতে পারে না। কিম্বা সকলের সামনেই তো আয়না রয়েছে। নিজেদের মুখ দেখলেই পারে। মালিকও ভাল—ওদের সঙ্গে সমান তাল দিচ্ছে।

হরকুমার ক্যাচ ক্যাচ কাঁচি চালাচ্ছে। হয়ে এল। ইদানিং মাঝে-মধ্যেই বশীকাকার কথা মনে পড়ে। দিব্যি আছে চুল কাটতে হয় না। লোকের কথাও শুনতে হয় না। একবার দেখা করলে কেমন হয়!

—আরো ছোট হবে।

বলে কি রে। তাহলে বছরে আর চুল কাটবে না। এ আবার কেমনতর লোক। হরকুমার খ্যাচ খ্যাচ করে আবার কাঁচি চালাল। বিরক্ত হয়ে গেছে, এখনো দাড়ি হয় নি। একজনের এত টাইম লাগলে খাবে কি? আজকে আবার র‍্যাশন তোলার দিন। বৌ কতদিন যাবৎ গজরাচ্ছে। পরনের কাপড় নেই। খালি নেই, নেই। বৌ যেন আজকাল ও-কথা ছাড়া আর কিছুই জানে না।

মন্দের ভাল। লোনের টাকা পেয়ে কলোনীতে থাকবার মত একটা জায়গা করেছিল। তাতেও কি সুখ আছে। রাতদিন ঝগড়া ঝাড়ি মারামারি হতোই, শান্তি নেই। এই ফান্ডে চাঁদা, ও ফান্ডে চাঁদা দিতেই ফতুর হয়ে গেল।

আসলে এখানকার জায়গা, মানুষজন ভিন্ন রকমের। আগাও নেই, মাথাও নেই। যার যেদিকে খুশী সেদিকে চলছে ঠিক-ঠিকানা কারোর নেই।

হরকুমার গালে ব্রাশ দিয়ে সাবান মাখাল। সাদা ফেনায় ফুলে ফেঁপে ভদ্রলোকের নাক চোখ তলিয়ে গেল। ক্ষুরটা সান দিয়ে হাতে পরখ করল। এবার হাত কাঁপলে রক্ষা নেই, রক্ত! চমকে উঠল। হরকুমারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। ভৈরব নদীর জলে রক্তের বন্যায় দেশ স্বাধীন হল। আর কাতারে কাতারে সেই রক্তনদী পেরিয়ে বনবাসে এল হাজার হাজার রাম-সীতা। অথচ কোথাও সোনার হরিণ দেখতে পেল না। তাল-তমাল তরুবেষ্টিতে কুটীরে আশ্রয় মিলল না। আয়নার মধ্যে হরকুমার সেই না-পাওয়ার শ্বাপদটাকে দেখতে পেল—

—বুড়ো কর্তা।

আবার আর একজন ডাকল। হরকুমার ক্ষুর থেকে আস্তে আস্তে সাদা ফেনাগুলি খবরের কাগজে সরিয়ে রাখল। অবিশ্যি মুখ তুলে কথা বলার প্রয়োজন মনে করল না। যদি আবার আয়নার মধ্যে চোখ পড়ে।

দাড়িকাটা হলে ডেটল লাগিয়ে স্নো মাখার সময় থমকে গেল। অবিকল বশীকাকার মতন। তবে কি তার ছেলে। ড্যাব ড্যাব করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ভদ্রলোক আর অপেক্ষা করল না। একটা নোট দিয়ে তড়িঘড়ি রাস্তায় নামল।

—অঃ দাদা, চেনেন নাকি।

বেঞ্চে-বসা একজন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা করল।

—আজ্ঞে?

হরকুমার যেন অনেকদূর থেকে উত্তর দিল। সবুজে রঙের গান্ধীমার্কা পাঁচ টাকার নোটটা দেখছিল। এখন এই টাকা নিয়ে কি করবে। লোকটা কেমন, চেঞ্জ না নিয়েই চলে গেল। তবে কি চিনতে পেরে করুণা করল।

না কারোর দান নেওয়া ঠিক নয়—

ভাবতেই হরকুমার দোকানের বাইরে এসে লোকজনের মধ্যে বশীকাকার মত দেখতে লোকটাকে খুঁজবার জন্য চৌকাঠে পা রাখল।

শিকার কাহিনী

শৈলেন চৌধুরী

অন্ধকার মাঠের আনাচ-কানাচ ধরে শ্বাপদের মতো নিঃশব্দে চলে ওরা। অন্ধকারে রঙিন শার্ট প্যান্ট মিশে যায়। বিড়ি পর্যন্ত ধরায় না, যদি শিকার পালিয়ে যায়। পালিয়ে গেছেও অনেক। এখন চালাক হয়ে গেছে। কান খাড়া থাকে বাতাসের শব্দ শোনার জন্যে। সেই সন্ধে থেকে ঘুরে ঘুরে এখন ওরা ক্লান্ত। ওরা চারজন, চারবন্ধু। সহকর্মী।

কথাটা প্রথম সমীর আবিষ্কার করেছিল। হ্যাঁ, আমাদের জীবিকার জন্যে আমরা সহকর্মী। একসাথে কাজ করতো কিনা বল? ফট্‌কে বলেছিলো যদি আফিসে চাকরি পেতাম তবে কেরানী হতাম, যদি কারখানায় খাটনি জুটতো তবে শ্রমিক। আর আমরা? আমরা কিরে নাদু? যদি কেউ জিগ্যেস করে মশাইরা কি করেন? আমরা বলব আমরা কর্মী। যদি বলে কিসের কর্মী? বলব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যান তবেই জানতে পারবেন নতুন পোস্ট তৈরী হয়েছে কিনা! বলে নাদু নিজেই জোরে জোরে হাসে। দাঁড়িয়ে পড়ল চারজন।

শিকারের শব্দ পাওয়া গেছে। পরিষ্কার গোঙানির শব্দ। অন্ধকারের বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওদের কানের পর্দায় আছড়ে পড়ল। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে নানাজাতীয় বিচিত্র শব্দে ওরা কেমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঠিক চিনে নিতে পারে। কখনও ফিসফিস, কখনও হাসি, কখনও ঝগড়া বা দর কষাকষি। এ সবেই অভ্যস্ত। কিন্তু এমন মৃত্যু যন্ত্রণার মতো গোঙানির শব্দ ওরা শোনেনি কখনও। সমীর বলল, জোরে চল।

অন্ধকার হাতড়ে ওরা এগোল শব্দে কান পেতে। বিরাট বটগাছের ঝুরি দুহাতে সরিয়ে দিয়ে। শিশির-ভেজা মাটির পেছল এড়িয়ে। ওরা এসে ঘিরে দাঁড়াল আদিম পাশবিকতায় লিপ্ত মানুষগুলোকে। এর পর অভ্যস্ত কাজ। লোক মোটে দু'জন। চারখানা ছুরি ঝলসে উঠল।

খবরদার! শালা নরকের কীট, মেরে ফেলব, বার কর শালা কি আছে। কেড়ে নেয় টাকাকড়ি। দুই সর্দারজীর জ্বালায়, যেন কুত্তা তাড়া খেয়েছে। নোট পকেটে পুরে ওরা পা বাড়ায় যাবার জন্যে। মেয়েটা তখনও শুয়ে। সাধারণত এ রকম হয় না। পথ আগলে দাঁড়ায়, ঝগড়া করে ওর রোজগার ছিনিয়ে নেবার জন্যে। ওরা চারজন যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়, মাগীটা টেসে গেছে বোধহয়।

ফট্‌কে এগিয়ে আসে, কিরে শালা বেঁচে আছিস?

মেয়েটা উঠে বসেছে ততক্ষণে। আমার হাতটা একটু ধরতো।

ফট্‌কের হাত ধরে, উঠে দাঁড়ায় ও। ওর কাঁধে ভর করে চলতে থাকে। বলে, আমায় একটু আলোয় নিয়ে চল।

কি গেরো! ফট্‌কে খিঁচিয়ে ওঠে। সায় নেই ওদের একাজে। অনেক বায়নক্কা, ঝামেলা অনেক। কিন্তু ওর যন্ত্রণায় কাতর কণ্ঠস্বর, কেমন যেন মুখ বুজিয়ে দিলে ফট্‌কের। ওকে নিয়ে এলো আলোয়! নিরাপদ, যেন অন্য দ্বীপ। আলোয় ওরা চমকে উঠল মেয়েটাকে দেখে। চার জোড়া চোখ নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকল। ওদের পাড়ার সুরমা! বেঁটে অরুণের বোন। শালা অরুণ গেল বছর রেলে কেটে মরেছে। বোনটা সেজেগুঁজে অফিস করত। শালী, থুঃ তোর অফিসের মুখে। রেলে কেটে মরতে পারলি নে। নাদুর স্বরে যন্ত্রণা।

মেয়েটা বসে পড়েছে ততক্ষণে। এলিয়ে পড়েছে। কথা নেই মুখে। চার জোড়া চোখের সামনে মাথা নীচু করে বসে রইল।

বিষ খেয়ে মরতে পারলি নে। সমীর চেঁচিয়ে ওঠে। চার জোড়া চোখের নির্মম ধিক্কার। শিশির-ভেজা ঘাসে কেমন কটু গন্ধ। সুরমা চোখ তুলল, দেখল সবাইকে। বলল, তোমরা সবাই তো ভদ্রঘরের ছেলে, তাই না?

চার জোড়া চোখ উত্তর দিল না।

তোমরাও তো চাকরি খুঁজতে এক সময়, তাই না? চার জোড়া চোখ জবাব খুঁজল।

তবে তোমরা কেন পাপের রোজগারে নেমেছ? উত্তর দাও?

সুরমার কথাগুলো মাঠের বাতাসে অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায়। ওদের কানের পর্দায় আছাড় খায়। হারিয়ে-যাওয়া একটা যন্ত্রণার বোধ পাক খেয়ে ওঠে গলা পর্যন্ত। এই মেয়েটা মনে করিয়ে দিতে চাইছে। রাগে জ্বলে

উঠতে চায় চার জোড়া চোখ। কিন্তু কি মনে করে দপ্‌ করে নিবে যায়। মেয়েটা তাকিয়ে আছে। জবাব চাইছে, ইচ্ছেগুলো নেতিয়ে যায় চার জোড়া চোখের। পাদু বলে উত্তর আমরা জানি না মাইরি!

মেয়েটা বলে, আমি জানি।

কি? চারজন একসাথে বলে ওঠে। নতুন কিছু শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে তাকায়। ও কিন্তু বলে পুরণো কথা। বলে, বাঁচার জন্যে।

শুধু বাঁচার জন্যে? হ্যাঁ, তাছাড়া কি? এই পুরণো সত্যি কথাটা ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছে। সুরমাও কি শুধু বাঁচার জন্যে? শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে? ওরা চারজন এবার নির্বাক। দক্ষিণের বাতাস ক্রমাগত আছড় খায়। বুকের কোথায় যেন ক্রমাগত জ্বলে ধিকিধিকি। অসহ্য লাগে। ওরা চারজন। কৈশোরের স্বপ্ন যৌবনে অন্ধকারে নিষ্ঠুর বাস্তবে মিশে আছে।

মেয়েটা উঠে দাঁড়ায়। যাবার জন্যে পা বাড়ায়। অবসন্ন দেহটা টানতে পারছে না যেন। ওদের দিকে আর তাকায় না মেয়েটা। কেমন যেন উদাস অবহেলা ওর চোখে।

ওরা চারজন ছট্‌ফট করে। অতীত আর বর্তমান দলা পাকিয়ে গেছে! ওদের আহত পৌরুষ দাপায়। একটা মুখের মতো জবাব ওরা খুঁজে পায় না। যা দিয়ে মেয়েটার উদ্ধত দম্ভ এক মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। যা দিয়ে বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়।

মেয়েটা সবে এক-পা এগিয়েছিল। হঠাৎ ফট্‌কে প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, দাঁড়াও।

সবাই চমকায় ওর কথায়। ফট্‌কে বলে—বোস সুরমা, তোমার যাওয়া হবে না।

কেন? সবাই একসাথে প্রশ্ন করে।

ফট্‌কে বলে, ওর হিস্‌সা আছে, রোজগার পাঁচটা হিস্‌সা হবে।

অন্যায় প্রস্তাব। কিন্তু কেউই প্রতিবাদ করতে পারে না। নীরব থাকে। এতোক্ষণে মনে হয় দক্ষিণের বাতাস বুকের ভেতরের জ্বালাটা অনেকখানি কমিয়ে এনেছে।

• কবিতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রসিদ হল না

তোমার জন্যে বিল কেটে চাঁদা চেয়ে পাঠিয়েছিলুম,
সুহৃত্তম, বলো, কত দেবে?
তুমি বলেছিলে, আনন্দ-নন্দিনী,
তোমার খুশিমতো অংক একটা বসিয়ে নাও,
তাই দেব।
বললুম, কত লিখব ঠিকঠাক?
উত্তর দিলে, যা তোমার গণনায় আসে।
মনে হল যে অংক বসাব তাই বুঝি কম হবে,
আর তুমি ভাবলে যে অংক লেখা হবে তাই বুঝি
আতংকের মতো।
আমার ভয় আমি বুঝি তোমার ক্ষমতাকে
সংকীর্ণ করছি,
তোমার ভাবনা তুমি বুঝি আমার আকাংক্ষার
কিনারা পেয়ে গেলে।
তুমি ভেবেও পেলে না আমি তোমার কাছ থেকে
কত দু'হাতে কেড়ে নিতে পারি,
আর আমার অস্বস্তি তুমি বুঝি বোঝনি
কত আমি উজাড় করে দিতে পারি তোমাকে।
আমি চাইলুম, তুমি দিলে না;
না, তুমি দিতে চাইলে, আমিই নিতে ভুলে গেলুম।
শূন্যই কি তবে পূর্ণের ঠিকানা?
বিলটা কাটা পড়ে আছে—
রসিদ হল না।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সে কি শুধু হাওয়ার বদল ?

মহুয়া বা মুমূর্ রমণী,
এসব ছাড়া কি আমি
পাথর-ফাটানো শাল, মহিষ-রঙের নদী,
হাতে খোদা কাঁকই দেখি নি ?

কেন তবে ভিন্‌দেশে যাওয়া ?
সে কি শুধু নষ্ট রক্ত বমনের প্রাচীন অভ্যাসে
হাওয়ার বদল—
প্রতিশ্রুত মুক্তি কোন পাড়ে ?

ধাতব হত্যার শব্দ জেগে ওঠে পাহাড়ে পাহাড়ে।

অরুণাভ দাশগুপ্ত

ফিরে আসি

ফিরে আসি
জাতভিখারীর চেয়ে কুশলী হাতের প্রান্তে
ছুঁয়ে নিতে উদ্ভিন্ন মমতা
নাকি
চাঁদমারি বিঁধে থাকা মায়াবী বিভ্রম ?
যে-রকম টানে মগ্ন বেলাভূমি, মোহিনী বাতাস,
আড়ালে নিঃশব্দে ওঁৎ পেতে রাখে চোরা বালিয়াড়ি !
ফিরে আসি
মহাঅরণ্যের মতো বিশাল নির্জনে
দুঃখ মুছে নিয়ে, প্রার্থিত সজন
তোমাদের প্রশান্ত চাতালে
সুখ আছে ?

জানো, কতোটা উত্তাপে হু-হু করে বাড়ে সুখ
শমীগাছে স্ফুলিংগের মতো ?
নাকি
নিহিত অসুখ
লক্ষ দ্রুততায় ব্যাপ্ত রক্তের গভীরে
সজনে অপ্রেম, যার প্রলম্বিত ছায়া পড়ে বিশাল নির্জনে।

অখিল দত্ত

অপ্রণয়িণী

হাত উল্টে শুধু ঘৃণাই ছড়ালে
অথচ এক কদম এগুলেই পেয়ে যেতে
সোনার কৌটোয় লুকিয়ে রাখা ভ্রমর
তুমি গেলে না।

তুমি বলেছিলে, দুঃখ মোচন হলে
গোলাপ হয়ে উঠবে বুক
বন্দী ভ্রমর মুক্তি পাবে সন্ধ্যামণির বুকে
দুঃখ মোচন হল না।

অন্নদাশংকর রায়

নব পদাবলী

শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে হিংসা সত্য
তাহার উপরে নাই।
হিংসায় যদি হাত রাঙা করে
সকলেই বলে জল্লাদ !

তা হলেই হবে বিপ্লব, আহা !
তা হলেই হবে আহ্লাদ !
মারতে মারতে মরতে মরতে
থাকবে না কেউ বর্তে
মর্ত্যের লোক স্বর্গ পেলেই
স্বর্গ নামবে মর্ত্যে।

অমিতাভ চৌধুরী

ছড়া

১

যদি আংরেজি না হটিতং
বলুন তো কী ঘটিতং
জনসংঘং চটিতং ।।

২

চীনের চেয়ারম্যান যদি হোন
আমার চেয়ারম্যান
চীনের খাবার আমার খাবার
হইবো না কও ক্যান ?

৩

লেকের ধারে প্রাতর্ভ্রমণ
নয় নিরাপদ আর,
মাংকি টুপির ভিতরে তাই
রাখুন রিভলভার।

আলোহীন পৃথিবী

প্রতি মুহূর্তে ভীরুতার নাগপাশে
জীবনটা জড়িয়ে জড়িয়ে
আমরা হতে চেয়েছি
সার্থক, পরিপূর্ণ।
লক্ষ কোটি নক্ষত্রের
বিচ্ছুরিত আলো হ'তে
যে আলো
অণু-পরমাণুর বুকে
নিত্য—উজ্জ্বল,
সে আলো
ভীরুতার দাক্ষিণ্যে
চায় না বেঁচে থাকতে।
আলোহীন পৃথিবীতে
যদি আলোর উৎসবের
থাকে প্রয়োজন
তবে ভীরুতার বর্ম ছেড়ে
নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ের
আছে প্রয়োজন।

অমল ভৌমিক

বাউল

কার তরে তুই উদাস হলি
বাউল মন রে
কারে আপন ভেবে আপনারে তুই
দিলি জলাঞ্জলি।

কে ওরে তোর কান্না শোনে
কে দেখে তোর চোখের জল
ও তোর ব্যথায়
কার বুক ফেটে যায় বল।

আকাশ থেকে সোনালি রোদ ঝরে
তোর ভাঙা মন যেন কেমন করে

ও তুই কার সোহাগে উতলা হলি
ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে গেলি
কারে আপন ভেবে আপনারে তুই
দিলি জলাঞ্জলি।

আনন্দ বাগচী

মধ্য দুপুর

এখন শুধু মাথার মধ্যে রাগী বোলতা
ঘুরছে ফিরছে অন্ধ পাখায়
এখন শুধু মগজ জুড়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরছে
এর সাথে তার তার সাথে এর কয়েক মিনিট
তারের বাঁধন,
পোড়ো বাড়ির ভিতের মধ্যে মধ্য দুপুর
শূন্য মাথায় শব্দ করে বৃষ্টি পড়ে
কাকের ডাকে চমকে ওঠে চিলেকোঠা
বিজুলী তারে খতম্ ঘুড়ি, বাদুড় ছায়া
অলক্ষুণে ভয়ের মত ঝুলেই আছে।
এখন শুধু মাথার মধ্যে অন্ধ পাখায়
জ্বলন্ত এক হলুদ বিন্দু
ঘুরে বেড়ায়।।

জার্নাল চুয়াত্তর

আমি একটা রোগমুক্ত সকাল চাই,
বিকেল চাই, রাত্রি চাই।

আমার কোন বন্ধু নেই, বান্ধবী নেই,
স্ত্রী আছে, 'বান্ধবী' নেই
স্ত্রী কি হায়, বান্ধবী হয়!

আমি কি একটা রোগমুক্ত
সকাল পাব? বিকেল পাব?
রাত্রি পাব?

এবং একজন অক্ষত
রোগমুক্ত বান্ধবী?

ইন্দ্রজিৎ বসু

তোমার শরীরে চাঁদ

সারাটা দুপুর তুমি নিঃসঙ্গ সল্ট লেকে
একা একা দীর্ঘশ্বাস ফেলো,
কৃষ্ণচূড়া মাড়িয়ে দিয়ে প্রতিটি লগ্নে হও
তরঙ্গ উদ্বেল,
সোনালী মাছের মতো হয়ে যাও কোন্‌দিকে
কখন উধাও?

দীপা-দীপালি আমার,
কি সাহসে ছুটে যাও কলির উপরে?
কেন একা একা বালুকণা কুড়াও?

তোমার শরীরে চাঁদ
সারারাত খেলা করে নীরবে···
অনন্ত নক্ষত্র কাঁপে, শিশিরের মত সব
মিশে যায় তরঙ্গে!

ওয়াজেদ আলি

পাখিরা উড়ে গেলে

পাখিরা উড়ে গেলে
আমাদের শস্যের ক্ষেতে
পড়ে থাকে হলুদ পালক
আর সেইসব দ্যুতিময় ভালবাসা
শব্দসম্ভার
স্মৃতি জমে থাকে
মনের ভিতর
তাই আমাদের সব অশ্রু
শব্দের ভিতর
আজীবন সুর হয়ে বাজে

কমল সাহা

বন্দীর নিবেদন

সতীর্থের রক্তমাখা বেয়োনেট হাতে নিয়ে
ওরা গতকাল রাতে আমার সমস্ত ঘর সার্চ করলো
অনেক নিষিদ্ধ দ্রব্য খুঁজে পেয়েছে
এবং এই অপরাধের জন্যে আমি এখন বন্দী—বন্দী।

ঘরের গোপনতম অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছিলাম
মানুষের জন্যে অমল ভালোবাসা
বিপ্লবীর জন্যে ধারালো সমর্থন
এবং সকলের জন্যে আমার সহস্র বেদনা, ঘৃণা।

আমি তো বন্দী হয়েই আছি
প্রেম যদি অপরাধ হয়
আজীবন সশ্রম দণ্ডভোগ করবো
শুধু মাঝে-মাঝে নিষ্পাপ গভীরতম আকাশ দেখতে দিও
মায়ের চোখের জলে, ভাইয়ের অশ্রুতে, রক্তে, ঘামে
দ্রবীভূত মাটির ওপরে রিক্ত ঘাস
স্পর্শ করতে দিও।

কবিতা সিংহ

রুমালে বেলফুল

রুমালে বেলফুল বেঁধে দুরন্ত বৈশাখে
কেন হতে উতলা অমল ?
নয়ন-সুকের ওই কোমল মেরজাই ভিজে ফুটত সুকের গেরুয়া
ও আমার চন্দন খোদাই অনুপম আত্মমগ্ন যুবা
রুমালে বেলফুল আহা রুমালে বেলফুল।

এখানে ধাঁধায় রঙ, ফুলে ফুলে ফেটে পড়ে সমস্ত বিকাল
তোমাকে অতীত থেকে পৌঁছে দেয় নীলবর্ণ ট্রেন
ব্যবধান জুড়ে দেয় মধ্যবর্তী রোমহর্ষ হাওয়া
গাঁটছড়া বাঁধা থাকে, মুঠোয় বকুল।
যা কিছু ক্ষণিক অন্ধ সীমিত আতুর তাই কব্জা করে কাল
আমার অমল থাকে নাগালের অনেক বাহিরে
চাঁদের হাতল খুলে নেমে আসে প্রতিদিন রুমালে বকুল বৈশাখে
গন্ধ তার আমার নিখিলে !

রুমালে বেলফুল ! আহা রুমালে বেলফুল !

কবিরুল ইসলাম

আমার অভ্যাসের মুখগুলি

আমার অভ্যাসের মুখগুলি আজ আর তেমন স্পষ্ট মনে পড়ে না।

তবে যে অভ্যাস মানে দ্বিতীয় স্বভাব শুনেছি
আর স্বভাব তো ধুলে যায় না
সময়ে, জলে যেমন ক্ষয়ে যায় নুড়ি

স্বভাব মরে না কিন্তু আমার একদা অভ্যাসের মুখগুলি
আজ বিবর্ণ, অ্যানেমিক, চেনা যায় না

তাহলে স্বভাবও বদলে নেয় ঘর অগোচরে
স্বভাবের সঙ্গে তাবৎ
অভ্যাসও মুখ পালটায় শীতের আনাজে
তাই আমার অভ্যাস মালায় বিবর্ণ ফুল পাতা
ঝরে পড়ে আর জেগে
ওঠে নতুন গাছগাছালি, বনান্তরে।

এক অভ্যাস থেকে আর-এক অভ্যাসে স্বয়ংক্রিয়
এই আসা-যাওয়া
নিহত স্বভাবে জন্ম এবং পুনর্জন্ম ॥

কুমারেশ চক্রবর্তী

আমিই তাজমহলের মালিক

সত্যি বলছি, চেষ্টা করেও একটা কবিতা এলো না কলমে।
শোনা মত, কাব্যের উপদেশ মত বারবার কান পেতেছি
তাজের সেই সাদা পাথরের কোণায় কোণায়,
কোন বোবা-কান্না কিংবা প্রেমের বিলাপ
কিছুই পাইনি শুনতে।
ভরা দুপুরে দেখেছি সদ্যছাঁটা সবুজ ঘাসে বসে,
স্মৃতিসৌধের সামনে জলাধারে স্থির ছায়া দেখেছি,
দেখেছি পূর্ণিমা রাতে নিখুঁত গোল চাঁদের বন্যায়।
তবুও না, একটিবারও ভাবাবেগ এলো না মনে।
অথচ সত্যি বলছি, চেষ্টা না করেও কেন জানি না কেমন করে
তাজের প্রতিটি পাথরে তোমার মুখ দেখেছি
মমতাজের শীতল কবরে হাত রেখে তোমার হাতের স্পর্শ পেয়েছি,
পেয়েছি তোমার বুকের উত্তাপ।
ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেকে হতভাগ্য শাজাহান না ভাবলেও
তাজকে বড় আপনার মনে হচ্ছিল,
যেন আমিই তাজমহলের মালিক।

সুখ

এক এক দিন সুখ আমার মেঘের চোখে কলঙ্ক দেখায়
দিনের পর দিন চলে যায়
শেষ কথা সহজে কি কাউকে একান্তে বলা যায়

অনেক কথা মেঘের ভিতর আনাগোনা শব্দের ভিতর
অনুভবে ছড়িয়ে আছে গাছের পাতায় পাতায়
সব কথার শেষ হয়ে যায় ভালবাসায়
নিজের মুখ দেখা যায় নিজের আয়নায়

এক এক দিন সুখ আমার মেঘের চোখে কলঙ্ক দেখায়
শেষ কথা সহজে কি কাউকে একান্তে বলা যায়।

কৃষ্ণ ধর

রমণার ঘাসে রঙ

[২৫ মার্চ রাত্রিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রহত্যা স্মরণে]

রমনার সবুজ ঘাসে চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে
আমাদের সহোদর, ভাই বোন, ওখানে শায়িত
ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো জল্লাদেরা ঘোরে ফেরে পথে
বাংলার ধূসর বুকে কী দুরন্ত জান্তব উল্লাসে ?
এত রক্ত পদ্মার স্রোতে !

কাল রাতে এসেছিল কাল বোশেখীর তীব্র ঝড়
বলে গেছে, মৃত নই, আছি আমরা এ মাটির ঘাসে
মৃত্যুহীন প্রতিজ্ঞায়, বাংলাদেশের প্রতি কোণে
জ্বলবে মশাল ফের আমাদেরি সন্ততির হাতে
সেদিনের জন্যে থেকো অপেক্ষায় তোমাদের ঘরে
দেখবে আমরা আছি বাংলাদেশের বুকে অন্য এক ভোরের শিশিরে।

গোপাল ভৌমিক

অন্য দিন অন্য মানে

কিছুতেই অন্য দিন আসে না জীবনে ;
হয়তো যতই ভাবি কামনাও করি
ততই সে সরে যায় দূর থেকে দূরে
হয়তো এলার্জি তার আছে অন্বেষণে।

এক দিন প্রতি দিন সব দিন
যেন সব এক ধাঁচে ঢালা
বিধিবদ্ধ নিয়মের ক্রীতদাস হয়ে
আসে আর চলে যায় বৈচিত্রবিহীন।

অন্য দিন স্বপ্ন হয়ে হাতছানি দিয়ে তবু ডাকে ;
প্রতীক্ষায় কেটে যায় অমূল্য সময়
তবু অনুশোচনায় ভরে না হৃদয়
খোঁজে সে আরেক মানে অন্য দিনে যা লুকিয়ে থাকে।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তিনটে কবিতা

১

এখন নিশান্ত নয়। রৌদ্রের সময়ে
পাখিটা ঝাপটাচ্ছে ডানা
খাঁচার ভিতর।
সূর্যমুখী, বজ্রপাত দ্যাখো,
আকাশ স্তব্ধতা ভাঙছে,
নিচে সাঁকো, নদীর মুকুর।

২

এখানে বেঁধেছি ঘর, বালুচরে, গোধূলির দেশে।
জ্যোৎস্নায় শরীর কাঁপে,
যেন সে অনন্ত রাত্রির হাহাকার

কি জানি কেমন করে বেঁচে আছি বিনা ভালোবেসে ?
কেন যে আশ্রয়হীন সমস্ত সংসার ?

৩

তোমাকে ডেকেছি আমি, অন্ধকারে, জলের প্রপাতে।
তবু তুমি প্রশ্ন করো ঃ
'কে আমাকে তীব্র ভালোবাসে।'
সেকথা জানি না আমি, অনন্ত প্রহরে
হয়তো সিন্ধুর ঢেউ তোমাকেই বুকে ধরে রাখে।

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকিত বিসর্জনে ভিখারী করেছো

আলোকিত নাভিমূলে কিভাবে
মোমের বিবৃতি এনেছো
দীর্ঘকাল চিরায়ত অলৌকিক স্বপ্নের ভিতর
শরীর ছুঁয়ে থাকবো কতকাল
সৌধ দেখো কিভাবে
ভেঙে ভেঙেই পড়ছে
আত্মবিসর্জন ভেবে অনাস্রব বিষাদে সামিল
তাহ'লে
নীলপদ্ম করতলে তুমিই যৌগিক প্রতিমা
সেই মন্ত্রে
আমাকে ভিখারী করেছো

গিরিধারী কুণ্ডু

ঘাতক শাসকের হুকুম

লাঙলের ধারাল দাঁত মাটি কামড়ে
তবু হবে না নতুন শস্য বোনা,
চেঁচামেচি, লাঠালাঠি শুরু
রক্তের ফোঁটায় আগুন নিভু নিভু।

ব্রজবুলি নয়,
ঘাতক শাসকের হুকুম—
তুমিও দ্যাখো আহত পাখির চোখ দিয়ে
খয়রাতী দৃশ্য !
এখন উত্তরবঙ্গের বন্যা আবার আসুক
ভেসে যাক উদ্ভিন্ন জল যৌবন।

ইচ্ছেটা স্বপ্ন ছোঁয়া—
হলুদ ধানের শিষ দুলে দুলে
ছুটির খবর লিখবে নীল কালিতে···
আমরা ধ্বংস স্তূপ থেকে ছুটব সেদিকে
অস্থায়ী ঘরকন্না, ঘরণী নিয়ে।

তা হবে না—
ঘাতক শাসকের হুকুম !

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমাদের বাংলাদেশ

আমার বাহু এখন থেকে বহু কিলোমিটার দূরে
যেখানে আমার তীব্র লক্ষ্যভেদী আঙুল ট্রিগারে ন্যস্ত,
যেখানে দাউ দাউ আগুনের মধ্যে একটা গোটা দেশ ঝলসাচ্ছে,
গোটা দেশ, একটা গোটা ইতিহাস,
যেখানে অর্থহীন বাতিল পতাকাগুলি আপনা থেকেই লণ্ডভণ্ড
এবং রবীন্দ্রনাথের গান নতুন করে ভালবাসছে
প্রত্যেকটি খড়ের ঘর।
আমার দৃষ্টি এখন চোখ থেকে বহু কিলোমিটার দূরে
যেখানে আমার ভাইবোনের স্বপ্নের উপর ট্যাঙ্ক এবং গানবোট
এবং শিলাইদহ ও সাগরদাঁড়ি চূর্ণ।

উপরে আগুন ছড়ানো এরোপ্লেন এবং নিচে
রাইফেল মেশিনগান ও মৃত্যুঙ্কর আর্তনাদ,
এবং এরই মাঝে প্রতিরোধ, অবরোধ, অর্জিত স্বাধীনতা

আমাদের বাংলাদেশ।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

বার্টেণ্ড রাসেল এবং নির্দেশ

আসুন আমরা যাই কল্পতরু বৃক্ষছায়ে প্রার্থিত কামনার
উজ্জীবন চাই ঃ একটা অব্যবহৃত স্বচ্ছন্দ পথ।
রাসেল এইমাত্র বলে গেছেন আমাদের হাতে হাত রেখে
ভদ্রলোকগুলো ইতর বলেই ওদের মুখে রেখেছো চোখ।

একদিন উৎকৃষ্ট ভদ্র বলে যখন নির্দিষ্ট করেছেন অন্য কেউ
তার প্রাত্যহিক আর্শির বুক রাসেলকে ধরেছেন শক্ত করে
মুখের আদলে হেঁটে খুঁজেছেন কিছু একটা
রাসেল খুঁজছেন কিছু একটা—
রাসেল এইমাত্র বলে গেলেন
অনিশ্চয়তার গহ্বরে ডুবে না গিয়ে ইতর শ্রেণীটাই
সোজা স্বর্গদ্যানে উঠবই
চলুন আমরা যাই কল্পতরু বৃক্ষছায়ে।

জীবনময় দত্ত

অসম্ভব এক ইচ্ছা

অসম্ভব এক ইচ্ছার জালে
আটকা পড়ে গেছি
বিস্মিত বিস্ময়
আর কিছু পেছনে ফেলে আসা
ছায়া ছায়া
ছবি নিয়ে ভবিষ্যতের
রঙ খোঁজার পালা।

কিছুতেই কিছু হয় না,
যেন নাটকের পর্দা ফেলার
ফাঁকে দু'টান বিড়ি ফোঁকা—
এভাবে তো চলতে পারে না কিছু
তবুও কি আশ্চর্য ! চলছে সবই
একবুক ইচ্ছা নিয়ে
কারণ
অসম্ভব এক ইচ্ছার জালে
আটকা পড়ে গেছি ।

জীবন সরকার

দখিনা বাতাস

আমি প্রেমের জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে চেয়েছি
কেয়ার ঝোপে
মালঞ্চের লুকানো কোন সৌরভ ।
যার চোখের নীলে ঘুম—
নিঃঝুম ।
ঘুঘু ডাকা দুপুরের রৌদ্রময় প্রবঞ্চনায় আয়ু
প্রতি নিয়তই ঘুরিয়ে যাচ্ছে
তবু
আমার দু'চোখে
জ্বালিয়ে রেখে নীলার দ্যুতি
রঙ্গন ঝোপের নিবিড় রক্তিম আহ্বানে
সাড়া দিয়ে হৃদয় রক্তাক্ত করি ।
যদিও জানি অবুঝ আবন্ধ সুরভির খোঁজে
হারিয়ে যাচ্ছে পরমায়ু
স্নায়ু পাচ্ছে—নিঝুমতার স্বাদ ।
অথচ
এইতো—সবে দখিনা বাতাস দিচ্ছে ।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই নির্জন মুখর দিন

ভোররাত্রের প্রথম ট্রেনেই ফিরে আসবার কথা ছিল—ফিরতে পারিনি
সেখানে কেউ নেই কোন জনমানব কোন কলরব মুখরিত বাড়ীর দেয়াল
তবু ভোররাত্রের প্রথম ট্রেনেই ফিরতে পারিনি

খাঁ খাঁ রোদ্দুর চারদিকে
শুধু এক পুরোণ মাদারগাছ প্রসারিত বাহু দিয়ে সূর্যকরোজ্জ্বল দিন
শুষে নেয়
লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে ঠাকুরমার সিঁদুরমাখা আধুলি পরিচিত হাসি হাসে
বাস্তুভিটের উপর উপড়ে-পড়া সুপারীর দেহ
পাঁচমাথার মোড়ে অশথ বট খেজুর বেল আর নারকুলে কুলের চারা পুঁতে
পঞ্চবটি গড়েছিলেন আমার ঠাকুর্দা
যাঁর সিঁদুরমাখা পায়ের ছাপ বাঁধানো আছে দেয়ালের গায়

বাঁধানো দিঘীর ঘাটে সারাদিন ছিপ ফেলে বসে থাকতে থাকতে
বাটিভর্তি মুড়ি আসত নারকেল কোরা রসওলা কাঁঠালের কোষ
এখন দোয়েলের চড়ুইয়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুই নেই
সিঁদুরমাখা রুপোর আধুলি লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে সশব্দে হেসে ওঠে

তরুণ স্যান্যাল

মৃতদেহ

অনেকগুলি হাতের বৈঠার উপরে তার দেহ
জনস্রোতের প্রবল ধাক্কার ভাটিতে
ফেনা, নাকি
মকরবাহিনী পূজার ফুল ভেসে গেল

এমনি করে একটা দিন চলে গেলে, একটি করে দুর্ভাবনা

এমনি করে একটা মানুষ চলে গেলে, এমনি এক ভাসান
এমনি করে একটা শব্দের অভ্যুত্থান আর বিনাশ

এমনি ঠোঁটের কুলুপ বন্ধ করব ভাবলাম
পাছে আমার শব্দগুলি অমনি ভেসে যায়

শেষ গাড়ি ধরবার জন্যই যতই ঊর্ধশ্বাস
তবু জানতে বাকি নেই ফাঁকা ঝুলিতে আছে
সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় ফুলে ওঠা
অনেকগুলি অমনোনীত শব্দ
আমার অতি চেনা জানা
ভালোবাসার মুখ
চোখের জলে ভেজা, দারুণ দাঙ্গাবাজ
অসম্ভব ভীতু, ভীষণ ডাকাবুকো
মন্থর উদ্দাম
আমাদের যৌবনের মতো।

তারাপদ রায়

আমিও একাকী

স্তব্ধতার অন্ধকারে উঠে আসে ফুল
লাল গোলাপের সমারোহ,
বলে, 'ডাকো তাকে
আমারই মতন সেই অবলাকে,
যার চুলে অন্ধকারে আমি ভালোবেসে জেগে থাকি।'

তুমি জানো অন্ধকার,
তুমি জানো ঘনচুলে গোলাপের গোলাপি স্তব্ধতা
আমি তো একাই বসে থাকি

আমার সামান্য ঘর, সংসার, বালক
লাল গোলাপের জন্য একটি ফুলদানি, চিনেমাটি
বিবাহের প্রথম বছরে
সে'ও কবে ভেঙে গেছে। যাই আসি আমি তো একাই,
ঘন চুলে অন্ধকারে ফুটে থাকে রক্তাক্ত গোলাপ
তুমি জানো, আমি তো একাই বসে থাকি
এতদিনে আমিও তো আমিও একাকী।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাজানো বাগানে ছায়া

দেশ বিভাগের পর নিষ্প্রদীপ মনের সুষমা
সাজানো বাগানে ছায়া অন্ধকার পথের ধুলোয়—
পায়ের তলায় নত ফুলগুলি রক্তের শিশির
শেষ বেলাকার শোকে গৃহস্থালী আজো অন্যমনা
দরোজার খিল খুলে যারা গেল পেছনে নিশির
প্রতীক্ষার দিনগুলি রক্তোচ্ছ্বাসে আবেগে উদ্‌গ্রীব
স্মৃতির শরীরে হাত মমতায় অতীত বুলোয়
প্রসারিত সীমানায় বাংলাদেশ রক্তে প্রতিমা
দু'চোখে নন্দিত স্বপ্ন বুকে জ্বলে আকাশ-প্রদীপ।
পরবাসের পরে কবে ফিরে যাবার পালা
অভিমানের পান্থশালায় অন্ধকারের দিন
বালককালে বাইরে যেতে ভীষণ ছিল ভয়
পঁচিশ বছর কেটে গেল দীর্ঘ স্বজনহীন
কাঙাল আমি ঘর চাইছি বুকেতে নেই জ্বালা
দুঃখ আমার ব্যবহারে ঘুরিয়ে আছি মুখ
বুকের কাছে টেনে নিলে ভালোবাসার জয়
দুঃসময়ে দু'হাত ভরে দেইনি কিছু সুখ।

দিনেশ দাস

লেকের ধারে

লেকের জলের দিকে চেয়ে চেয়ে বলেছিলে যেন কোন্ ফাঁকে,
কী যেন গোপন কথা শোনাবে আমাকে।
মনে হ'ল, পাথরের শহরেতে তুমি এক নীল হ্রদ, নারী!
জলের বুদ্বুদগুলো তোমার শরীর ঘিরে
চুমকি-বসানো নীল সাড়ি।

চোখের পাতার মত ধীরে ধীরে যেই তুমি খুললে হৃদয়
মনে হ'ল বুদ্বুদের সাড়িখানি স'রে গেল হঠাৎ হাওয়ায়
টলটলে সবুজ প্রাণের জল ক'রে দিল সব জলময়
উদার উলঙ্গ মহিমায়।

সরোবর কিংবা তুমি—কার জলে তলিয়ে গেলাম,
মাছের মতই আমি সেই জলে সাঁতরাই রোজ
পাখা নেড়ে একটু একটু ক'রে সেই স্নিগ্ধ জল করি পান
কী সে জল? কার জল? আজও আমি পাইনিকো খোঁজ।

দীপক কর

অভিজ্ঞতার সালতামামি

সব মানুষকে এখন আমি
ভীষণভাবে চিনে নিয়েছি
অভিজ্ঞতার সালতামামি
কষ্ঠিপাথর একনজরে-ই।

শব্দফন্দ আর লাগে না
তাসে তাসে রঙ মেলাতে
ঘুম থেকে আজ উঠে পড়ি
এলার্ম বাজার অনেক আগে।

দিব্যেন্দু পালিত

তোমরা এখন যাও

মুখের ভিতর ঘাম, এইমাত্র স্মৃতি ছুঁয়ে এসেছে নিঃশ্বাস—
পাপোষে রক্তের দাগ চ'লে আসে ঘরের মেঝেয়—।
বিস্তর যুদ্ধের পর; রাস্তার দু'ধারে কোনো নির্মাণ ছিল না,
ছিল না নারীর হাত, শিশুদের কোলাহল, বৃদ্ধের ভর্ৎসনা—
কিংবা জলসত্র, পাপ ধুয়ে যায় তেমনি উচ্চারণ—
এমন কি প্রথামতো বিকল্প ছিল না।

আমি তার হাতে দেবো মানপত্র, নিবীর্য মাটির
শস্যের আরকে পুণ জয়ী দেবতার মদ, আমার শোণিত,
নিঘুর্ম রাতের থেকে ছেঁকে-আনা স্বপ্ন আর কিছু
অস্ফুট ফুলের বীজ, অহংকারী উত্তরাধিকার—
দরজায় কপাট দেবো, বহুকাল পড়েছিল খোলা।

তোমরা এখন যাও, আমার বিশ্রাম জুড়ে চীৎকার কোর না!

নচিকেতা ভরদ্বাজ

অনিন্দ্য পরমা

অনিন্দ্য মৃত্যুর পর অপরূপ উৎসবের মত তুমি আস
আমার আঙিনা ভরে পল্লবিত ঋতুর সম্ভারে
সমাহিত পূর্ণতায়। তখন আর আমি কোনো হৃদয়ের ঝড়ে
রক্তের নির্মোহে বাইরে বেরোবে না,
চেতনা ও চেতনার সমস্ত উল্লাসও
স্তব্ধ হবে তোমার ঐ অতল উৎসারে।
যৌবনের স্বর্ণস্বর কানে কানে বলেছে ঠিকানা—
জীবনের অতিপ্রায় জয় বা বিজয়ে নয়, নম্র প্রণিপাতে,
প্রশ্নহীন সমর্পণে, তাহলেই আঙিনায় আশ্চর্য অজানা

একটি আলোক এসে সব কিছু মুছে দিতে পারে
সমস্ত ম্লানতা-ভয়-দুঃখ-ব্যথা। স্থনির্মল শুশ্রূষার হাতে
যন্ত্রণায় ফুটে উঠতে পারে যে যূথীতে,
অপূর্ণতা, পূর্ণতার ধ্যানে।

এই সব জলধারা জীবনের রুদ্ধ জ্যামিতিতে
ফসল ফলায়, আনে সবুজ সোনার
স্থির দীপ্ত সমারোহ ঃ আনন্দিত গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে
এই সব লেখা আছে। প্রাণ হয় প্রসন্ন বিস্তার।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জন্মভূমির দিকে

সীমান্তের ওইদিকে আমার জন্মভূমি
এইদিকে আমার স্বদেশ।
আমি এইদিকে দাঁড়িয়ে
ওইদিকে তাকিয়ে আছি।
আমি দেখছি,
আমার জন্মভূমির আকাশ রক্তে লাল হয়ে গেল।
আমি ভাবছি,
আমার বন্ধু আর সতীর্থেরা আজ
কীভাবে কোথায়
দিন কাটাচ্ছে।
কী করছে খালেক আর রহিম আর আনোয়ার ?
তারা কী জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে,
নাকি রাস্তায় নেমে
বুকের রক্ত ঢেলে গড়ে তুলছে প্রতিরোধ ?
আমি আমার অস্তিত্বকে দুই খণ্ড করে
নিজেকে বার বার শোনাচ্ছি ঃ
সীমান্তের ওইদিকে আমার জন্মভূমি,
এইদিকে আমার স্বদেশ।

নির্মল বসাক

মুখ তো শুধু মুখই খোঁজে

নাগচম্পা বনের ভিতর পথটা কেন বেঁকে গিয়েছে
পাড়ের কাছে কেন বা নদী বায়না ধরছে উথাল পাথাল
যুবতীমন পাক খাচ্ছে—টানা পোড়েন শিল্প সভা
বাজিমাতের অধিকারী—মাকুর মারে দগদগে ঘা
শালুক সায়র মধ্যিখানে ঃ মুখ তো শুধু মুখই খোঁজে
ধুলোয় মাখা টলটলে জল ডাকছে ধূসর কুয়াশারে।

পলাশ মিত্র

চিতা নির্বাপিত, চিতা বহ্নিমান

এখন আর বন্ধুর জন্য কাঁদি না।
এখন আর বন্ধুর মুখে
ভালোবাসার স্বপ্ন দেখি না ঃ
বন্ধুর জন্য এখন আর
নিঃশব্দ নিস্তব্ধ
সন্ধ্যাকাশকে মুখরিত করি না।

এখন ঘুমের মধ্যে সাপের স্বপ্ন দেখি।
সাপ এবং বন্ধু
বন্ধু এবং সাপ
এখন সবই একাকার।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমি ওই ফুলগুলির কাছে যাবো

একা থাকতে পারছি না
একা হলেই রক্তমাখা নিহত ফুলগুলি দুলে ওঠে
অন্ধকার ছিঁড়ে দুলছে ওই আহত নিহত ফুলগুলি

মাটি ঢেকে যাচ্ছে শুকনো ফুলে বীজে
আর দ্যাখো : মুহূর্তে জ্বলে উঠছে রক্তচাঁপা শ্মশানচাঁপা

আর ঘুমুতে পারছি না
ফুলগুলি হাত বাড়িয়ে ধরতে চায় মুক্তি
কাঁটাতার ছিঁড়ে আছড়ে পড়ছে বাতাসে
ছিঁড়ে যাচ্ছে পাঁপড়ি আর
ঝরে পড়ছে রক্তরাঙা ফুলের রেণু

ওখানে কে ? ওই অন্ধকারে কার হিংস্র থাবা ?
ওরা শয়তান, নখে ওদের উদ্যত মৃত্যু
ওরা উপহার দেয় মরণ আর বরণ করে ঘৃণা
ওরা উপহার দেয় মুক্তি আর বরণ করে অভিশাপ
আমি ওই ফুলগুলির কাছে যাবো আর সরিয়ে দেবো অন্ধকার
ঘাতকের মুখে ছুঁড়ে দেবো পাপড়ি আর রেণুর দাহ
ঝলসে যাবে ওদের মুখ ওই রক্তপিপাসুদের ঘৃণ্য দুষ্টি
দুলে উঠবে হাওয়ায় প্রজ্বলন্ত রক্তচাঁপা ওই শ্মশানচাঁপা
আমিও ফুল হয়ে দুলতে থাকবো ওদের পাশে
আমৃত্যু ওই জ্বলন্ত ফুলেদের পাশে আনন্দে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ওরা এবং আমি

ওরা কেন অমনভাবে তাকায়
ঘৃণা করে ? ঈর্ষা করে নাকি ?
বুঝি বুকেই বসিয়ে দেবে ছুরি
হঠাৎ পেলে ফাঁকায় !

নাকি আমিই জ্বরের ঘোরে শুধু
ভুল দেখছি, ভুল করছি, ভুলে
ছিঁড়ে আনছি টালমাটাল শিকড়—
উঠোন জুড়ে, মরুভূমির ধূ ধূ ?

ভুল বা ঠিক পুড়ছি একই তাপে
এবং তার কারণ, শুধু ওরা,
আয়না জুড়ে অনেক ছায়া দোলে—
আয়না নয় আমার মাপে-মাপে ।।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

কে কার জন্যে

জ্যোৎস্নার জাজিমে সবুজ ছায়া, না ঘাসের জাজিমে জ্যোৎস্না ?
আমার প্রায়ই ভুল হয়ে যায় আজকাল
আমি বুঝতে পারি না
মধ্যরাতের চাঁদকে অর্ধেক আড়াল করে মেঘ, নাকি
মেঘ ঢেকে দিয়ে অর্ধেক চাঁদ উঠছে আকাশে ।
যতদূর দেখতে পাই অর্জুন গাছের ছায়ায় হেলান দিয়ে
সারি সারি ঘুমন্ত বাড়ি
কোন্ জানলায় আলো জ্বলে উঠতেই একটি ডাল সরিয়ে
নিল তার ছায়া ।
ছায়ার জন্যে আলো, না আলোর জন্যে ছায়া ?
কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে যায় সব কিছু
আমি বুঝতে পারি না
স্পষ্টত
কে কার জন্যে এবং কতখানি ।

প্রণব মাইতি

তবুও ছবির স্মৃতি

সব ছবি, ছবি থাকে, থাকে না অনেকে ।
এবং আমার কাছে অনেক ছবির স্মৃতি
বাল্যের উঠোনে টানে টুকরো রোদ্দুরে
যেখানে খেজুর রসে মৌতাত জমে ওঠে
ঠেলাঠেলি ছায়ারোদে আড়াল আবডাল

সব ছবি, ছবি থাকে, থাকে না সবাই
মনে পড়ে যায় দূর, বিষণ্ণ রৌদ্রের রং
জুনপুটে অস্তাচল—হাঁটছি আমরা।
ধানক্ষেত শুয়ে থাকে হিমে পিঠ পেতে
শুটকী মাছের গন্ধে, অন্ন-প্রাশনের স্মৃতি
ছোট ছোট জেলে বাড়ী সুখের সংসার।

অথবা, একটু পরে
সমুদ্র সৈকত থেকে শ্মশানযাত্রীর দল নগ্ন পায়ে
ফেরে।
তখনও ছবির মত ম্লান অস্তাচল নিয়ে
এ সকলই ছবি, তবু ছবি নয় মোটে।
স্মৃতিকে জুটিয়ে এনে ছবির মতন।

প্রত্যূষপ্রসূন ঘোষ

মা ও শিশু

ওই শিশুকুঁড়ি গন্ধ দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে বাতাস
স্বচ্ছ রোদের রোম অতি মৃদু ঢেকে দেয়
কার্নিশে ব্যস্ত পাথরের তুলতুল দেহ
পাখনা থেকে শুকিয়ে নিচ্ছে শিশির
এখনি আকাশ পাবে, তাড়াতাড়ি খুঁটে নিচ্ছে গম দানা

মানুষের বাড়ন্ত সন্তান তার কচি দুই হাত
জানলার বাইরে বাড়ালেই স্বয়ং রোদ্দুর হয়ে যায়
অথচ রেণুতে রেণুতে মাখে মায়ের গায়ের স্পর্শ
একই প্রাণ প্রবাহিত তবু যেন আলাদা পৃথিবী
পুরুষের প্রতিসম প্রাণজ উত্তাপ
অফুরাণ অন্বয়ে জাগো আশাবরী টোড়ি
পাতার বেহালা বাজে রক্তের ছড়ে

তোমার ইচ্ছের রঙ উড়ে যায়
সুবর্ণ রোদে পায়রার পাখায়

গোলাপের ক্ষতস্থান ধুয়ে দাও ঝুলন্ত আধারে
বধির অরণ্যে যাবে ভ্রমরা যুবতী
এইখানে বেঁধে রেখে ক্লান্ত অশ্বখুর।

প্রশান্ত রায়

রক্তের গন্ধ তোমার শরীরেও

রক্তের ছোট্ট নদী মন্থন করে
নিশ্চুপ সতর্ক ব্যাঘ্রের ন্যায় উঠে এসে,
তোমার দেহের নম্র লালিত্যে
স্থির থাকতে পারিনি বুদ্ধের মত।
জড়িয়ে ধরেছি নিরালায় একা পেয়ে
মুখ গুঁজেছি তোমার পাখীর পালকের মত হালকা স্তনে
রক্তের গাঢ় রঙে সীমন্তিনী করার পর—
হঠাৎ নির্বাক আমি—নিঃশব্দ, অবাধ্য
রক্তের গন্ধ তোমার শরীরেও।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নজরুল

বিধাতার এক সুর
করেছিল বুঝি পথভুল,
তার-ই নাম জানি নজরুল।
মলিন মাটির দেশে সে সুরের দেখেছি আগুন,
দিকে দিকে অনির্বাণ শিখা,
তাহারে বরিতে আজ মহাকাল আপনার হাতে
আঁকে জয়টিকা!

বিষ্ণু দে

আমরা

আমরা যে আত্মহারা প্রব্রজ্যায়,
বাহুতে যে প্রতিষ্ঠ স্বদেশ,
প্রত্যেকে ধরিছে ইষ্ট সন্দোপনে।
ভাবি কেউ পায় না উদ্দেশ।
দুর্লভ শ্রেয়সী হাতে, কি উদ্বেগ
জন্মমৃত্যু মুহূর্তে উচ্ছ্বসি'—
আবিভূর্তা—একি সেই জন্মভূমি
স্বর্গাদপি সেই গরীয়সী ?
প্রত্যেকেই ধরেছি মূর্তি—যথাশক্তি,
প্রত্যেকেই বাহুর তর্পণে
প্রত্যেকে আপন বিম্ব দেখি বুঝি
অন্তহীন অতল দর্পণে।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

কাক

হঠাৎ জমলো কিছু নীল মেঘ
বৃষ্টি এসে ভেজালো পাঁচিল
ভেজে কৃষ্ণকলি ও দোপাটি
ভেজে মাটি।
ঘড়িতে চারটে বাজে যেই
অমনি দোলনচাঁপা ফোটে
ঠোঁটে নিয়ে জল
কোথাও শুষ্কতা নেই, অবিকল
বর্ষার নিসর্গচিত্র। শুধু একলা কাক
পাঁচিলে পালক ঝাড়ে বার বার।

ও কি শুধু শুষ্কতা বাঁচায়, নাকি
ব্যক্তিত্বও ? অথবা নিসর্গ জুড়ে ও-ই
থেকে গেল একমাত্র ফাঁকি ?

বিনয় মজুমদার

কলকাতায় থাকার উপায়

রেলের লাইন ছেড়ে ডান হাতে নেমে পড়ে মিনিট পাঁচেক হেঁটে এলে
এই যে নিকুঞ্জ মতো মনে হয় ওইখানে আসা যায় আম লিচুভরা
বাড়িতে বিস্মিত হয়ে থাকা যায়, নগরের লিচুগাছে আমগাছে কোলে
ফলই ফলে না, হায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের মাঠে আমগাছগুলি এরূপ নিষ্ফলা।
তবে সত্য কোনখানে, গ্রামের বাগানে না কি নগরের পথে পার্কে মাঠে ?
তার মানে ফল ফলা নিসর্গের নীতি, না কি না ফলাই প্রকৃত বাস্তব ?
কাউকে জিজ্ঞাসা আমি করিনি তো, দেবদারু গাছ কিম্বা তারাকে করিনি
কারণ নিশ্চিতরূপে জানি ফল না ফলাই যথাসত্য, ত্রুটিরূপে ফল হতে দেখি।
অনেক গ্রামীণ ত্রুটি এইরূপে ধরা পড়ে, পড়ে যায় নগরের নিখুঁত নিরিখে।
এইখানে গ্রামে থাকি ক্বচিৎ নগরে যাই কারণ পাই না খুঁজে মৃত দোপাটিকে।

বিপ্লব চন্দ

চেনা মুখ

অবিকল চেনা মুখ দেখি পথে যেতে যেতে, সে যেমন
শান্ত ছিল ধীর চলাফেরা ;
চোখের আড়ালে ছিল কৌতূহল
চঞ্চুপট চতুরতা।

আশ্চর্য ব্যবহারে দেখি হুবহু মিল !
ভুল কি আমারই হলো ; নাকি মনের বিভ্রম
যেমনটি জড়ানো ছিল জাফরান শাড়ী, সবুজ ব্লা—
কিংবা বাজুতে রয়েছে তাঁর মায়ের তাবিজ।

কোথাও অমিল নেই ; তবু বার বার মনে হতে থাকে
সে তো রয়েছে অন্যত্র বরফের দেশে।
এখানে কিভাবে সম্ভব—সে তো চলে গেছে বহুকাল আগে
মুখোমুখি হবে না আর ; এই ছিল কথা, তবু একি হায়—
কে তুমি ! আমার মনের ভুলে অবিকল আসে
হঠাৎ চমক ভাঙে দেখি খুব হৃদয় আবেগে
কোথায় সে আলোর রশ্মি
ভ্রান্তি কি আমারই হবে দীর্ঘ দিন দেখি না বলে !

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আবহমান বাংলার কবিতা

'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী' এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে ?'

—ঘুমপাড়ানী ছড়া

বর্গীর চেয়েও
কে ভীষণ
বুলবুলি, ধান খেয়ে যায়
হেমন্তে

চাষীর ঘরে
কুপিও জ্বলে না, শিশু
পাখি দেখে ভয় পায়

সোনার বাংলায়
মুঠি মুঠি সোনা ধুলো হয়, জননীর
মুখে ঘুমপাড়ানীর গান
রোদনের মতো

মনে হয়
বুক থেকে উঠে আসা
বাংলার শপথ

রক্তে ভাসে।

বীরেন মিত্র

মুঠোভরা কিছুটা সময়

আলেখ্যের সুনির্মল স্বপ্নকিছু
ঊষা আর আকাশের নীলে
আবির্ভূত হয়েছিলো
মানবী, দানবী কিংবা দেবী
নীলাঞ্জনা
ঘন অগ্নিশ্বাসে—
যায় নাই চেনা

অসীম লাবণ্যধারা
বিকশিত উৎপলিনী
স্পর্শে গন্ধে
দিয়েছিলো ধরা
উর্ব্বশী—সোনালী বাসরে
রঙে রসে সুরভিত ঘ্রাণে
তৃপ্ত নীহারিকা

মুঠোভরা কিছুটা সময়
অনন্ত ব্যাকুল
সীমাহীন।

এক নবদম্পতির উদ্দেশে—চট্টগ্রামে

আজ রাত্রে বালিশ ফেলে দাও, মাথা রাখো পরস্পরের বাহুতে,
শোনো দূরে সমুদ্রের স্বর, আর ঝাউবনে স্বপ্নের মতো নিস্বন,
ঘুমিয়ে পোড়ো না, কথা ব'লেও নষ্ট কোরো না এই রাত্রি—
শুধু অনুভব করো অস্তিত্ব।

কেননা কথাগুলোকে বড়ো নিষ্ঠুরভাবে চটকানো হ'য়ে গেছে,
কোনো উক্তি নির্মল নয় আর, কোনো বিশেষণ জীবন্ত নেই ;
তাই সব ঘোষণা এত সুগোল, যেন দোকানের জানলায় পুতুল—
অতি চতুর রবারে তৈরি, রঙিন।

কিন্তু তোমরা কেন ধরা দেবে সেই মিথ্যায়, তোমরা যারা সম্পন্ন,
তোমরা যারা মাটির তলায় শস্যের মতো বর্ধিষ্ণু ?
বোলো না 'সুন্দর', বোলো না 'ভালোবাসা', উচ্ছ্বাস হারিয়ে
ফেলো না
নিজেদের
শুধু আবিষ্কার করো, নিঃশব্দে।

আবিষ্কার করো সেই জগৎ, যার কোথাও কোনো সীমান্ত নেই,
যার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় চিরকালের সমুদ্র থেকে,
যার আকাশে এক অনির্বাণ পুঁথি বিস্তীর্ণ—
নক্ষত্রময়, বিস্মৃতিহীন।

আলিঙ্গন করো সেই জগতকে, পরস্পরের চেতনার মধ্যে নিবিড়।
দেখবে কেমন ছোটো হ'তেও জানে সে, যেন মুঠোর মধ্যে ধ'রে যায়,
যেন বাহুর ভাঁজে গহ্বর, যেখানে তোমরা মুখ গুঁজে আছো
অন্ধকারে, গোপনতায় নিস্পন্দ—

সেই এক বিন্দু স্থান, যা পবিত্র আক্রমণের অতীত,
যোদ্ধার পক্ষে অদৃশ্য, মানচিত্রে চিহ্নিত নয়,

রেডিও আর হেডলাইনের বাইরে সংঘর্ষ থেকে উত্তীর্ণ—
যেখানে কিছু ঘটে না শুধু আছে সব।

সব আছে—কেননা তোমাদেরই হৃদয় আজ ছড়িয়ে পড়লো
ঝাউবনে মর্মর তুলে, সমুদ্রের নিয়তিহীন নিস্বনে,
নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে, দিগন্তের সংকেতরেখায়—
সব অতীত, সব ভবিষ্যৎ আজ তোমাদের।

আমাকে ভুল বুঝে না। আমি জানি, বারুদ কত নিরপেক্ষ,
প্রাণ কত বিপন্ন।
কাল হয়তো আগুন জ্বলবে দারুণ, হত্যা হবে লেলিহান,
যেমন আগে, অনেকবার, আমাদের মাতৃভূমি এই পৃথিবীর
মৃত্তিকায়—
চাকার ঘূর্ণনের মতো পুনরাবৃত্ত।
তবু এও জানি ইতিহাস এক শৃংখল, আর আমরা চাই মুক্তি,
আর মুক্তি আছে কোন পথে, বলো, চেষ্টাহীন মিলনে ছাড়া ?
মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, মানুষের সঙ্গে বিশ্বের—
যার প্রমাণ, যার প্রতীক আজ তোমরা।

নাজমা, শামসুদ্দিন, রাত্রির বুকে লুকিয়ে থাকা যত প্রেমিক,
যারা ভোলোনি আমাদের সনাতন চুক্তি, সমুদ্র আর নক্ষত্রের সঙ্গে,
রচনা করেছো পরস্পরের বাহুর ভাঁজে আমাদের জন্য
এক স্বর্গের আভাস, অমরতার কল্পনা ঃ

আমি ভাবছি তোমাদের কথা আজকের দিনে, সারাক্ষণ—
সেই একটিমাত্র শিখা আমার অন্ধকারে, আত্মার চোখের সামনে
নিশান।
মনে হয় এই জগৎ-জোড়া দুর্গন্ধ আর অফুরাণ বিবমিষার বিরুদ্ধে
শুধু তোমরা আছো উত্তর, আর উদ্ধার।

বাণিক রায়

ঠাণ্ডা জল

পাপের বিষের মতো ভালোবাসার আপেল
আমার নির্জন বক্ষ জুড়ে ভরে আছে
ব্যথার পাতার ছায়ার আড়ালে,
গাছে গাছে হঠাৎ বিকেলে ঝড় আসে,
বিষণ্ণ মেঘের নিঃস্ব জল
ঢেকে দেয় আমার গাছের আলো
রক্তে মিশে যায় বিষের তরল নদী, ফল পচে,
কালো জলে বাসনার ঢেউ—
কোথায় কোথায় তুমি ?
অনুভবে তোমার শরীর ছুঁয়ে আমি
নিভৃত রাত্রির গানে,
আমার দেহের চতুর্দিকে
ঢেউয়ের মাথায় সাপের বিদ্যুৎ-ফণা
বিষ ঢালে, ওপরে দিগন্ত পৃথিবী নির্জন আকাশ,
অনুভবে তোমায় পেয়েছি, আমার আঁধার,
চারিদিকে ঠাণ্ডা জল—

বাসুদেব দেব

আরশোলা

আরশোলা উড়ে যায় ঘুমের ভিতর স্বপ্নে অন্তর্গূঢ় নিম অন্ধকারে
বাদামি ডানার গায়ে পচে ওঠা উচ্ছিষ্টের অন্তিম আঘ্রাণ
বাংলার চোখের জল কফিঘর থেকে আরো দূরে
সকালবেলার প্রথমে কাগজে থাকে অক্ষরের কাঁটাতারে ঘেরা
সুরক্ষিত গণতন্ত্র গোলাপের হাসি

আরশোলা উড়ে যায় পালঙ্কের নিচে ভাঙে শান্তির কৌমার্য
এখানে সৃষ্টির যন্ত্র নপুংসক অথবা নিয়তি
নিয়ন্ত্রণ করে আর উচ্চাঙ্গ সংগীত গায়, এবার শরতে
ঘাসের ওপর আমরা শিশিরে মিশিয়ে দেব পদ্যের আতর

বাংলাদেশ তুলে নেয় দীর্ঘ শীর্ণ হাতে ফলিডল
রাজভবনের থেকে দূরে, বর্ণ থেকে বর্ণান্তরে
অক্ষরমালার পিছে কালিঝুলি মেখে
আরশোলা উড়ে যায় ঘুমের ভিতর স্বপ্নের অন্তর্গূঢ়
নিম অন্ধকারে

বিনোদ বেরা

সাম্প্রতিক আমি

আস্তে আস্তে একদিন বুঝতে পারি
অন্ধের মত একই জায়গায় ঘুরছি,
অবিরল সামনে যাবার চেষ্টায় অস্থির
অসাড় নিঃসাড় স্বপ্নে ও ঘুমে চলার বিরাম ছিল না।
মনে মনে ভাবি উদ্দাম সহর নগর ছাড়িয়ে
চেনা পৃথিবীর মত্ততার নাগালের বাইরে
অনেক অনেক দূরে চলে যাবো।

একই জায়গায় চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে
চাষবাস খেতখামার পশুপালন পত্নীপুত্র নিয়ে
গৃহস্থ হওয়ার বাসনা জাগে আমার,
সরল সুন্দর শ্রমের স্নিগ্ধ মন্থর প্রহরগুলি...
শস্যক্ষেতের শোভা ও সঞ্চয়
মনে প্রাণে যত পল্লবিত হতে থাকে
ততই আমার কাছে সভ্যতার ছলনা লোভ মায়াবী তৃষ্ণা
অসার প্রতিপন্ন হয়।।

বেবী আনওয়ার

৭৩ ঃ বেঁচে আছি

এক বুক তৃষ্ণা বুকে নিয়ে
আজও আমি বেঁচে আছি।

মৃত্যু, প্রেম, ভালোবাসা ঘৃণা
এবং রাত্রি দিন দুর্ঘটনা
কিছুই এখন আর আমাকে
আগের মত তেমন করে
করে না চঞ্চল, বিচলিত
এবং অশ্রুসিক্ত।

এক বুক তৃষ্ণা বুকে নিয়ে
এক বুক স্বপ্ন বুকে নিয়ে

আজও আমি বেঁচে আছি
আজও আমি
বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছি
বেঁচে থাকার চেষ্টায় আছি
এই তিয়াত্তরে
রোজ। রোজ। প্রতিদিন।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

নাম বাংলাদেশ

যে-নাম খুঁজেছে নদী
বিল বন দোয়েলের শিস্
যে-নাম নিঃশ্বাসে নেয় রাত্রির কোরক
পলাশে কাঞ্চনে নাম চমকে ওঠে দূর গাঁয়ে লণ্ঠনের আলো
সে যাকে ডেকেছি আমি

পেয়েছি ভেবেছি আমি নাম প্রিয়নাম
শৈশবের বর্ণমালা যৌবনের ভাষা-ভুলানিয়া ভাটিয়ালি

সেই খেলাঘর ধুলো ধুলো কতকাল
কতকাল ভুলে আছি শৈশব স্মৃতির সেই শব
তারুণ্য কখন বিস্মরণ
আর কার ডাকনাম মুছে-মুছে যাওয়া জলছবি

আচমকা মর্টার ট্যাঙ্ক রাইফেলের ধ্বনি বজ্রধ্বনি
তড়িৎ সেবার-জেট বিস্ফোরণ ধস
সীমান্ত চেকপোস্ট দেশ-দেশান্তর উড়ুক্কু ঝড়ের মুখে কুটো
বিগত আগামী দিন রাত্রি বর্তমান ঘূর্ণি
ঘূর্ণি···ঘূর্ণি
বিধ্বস্ত ভূগোল—
এক নদী রক্ত এক রক্তের সমুদ্রে খেয়া দিয়ে
একটি হা-হা চিৎকারের চিঠি নিয়ে ও কে
কে এলে ? শৈশব এলে
অক্ষত কৈশোর এলে
দ্বিখণ্ডিত বর্তমানে কিংবা এলে নাম
বাংলাদেশ !

আ মরি বাংলাভাষা···
আমার সোনার বাংলা···
কোন্ বাংলাদেশ !
এ কোন্ পাখির গান মেশিনগান সঙ্গত বাজায়
এ কোন্ পলাশ লাল মানুষের রক্তে স্নান সারে
সোঁদা মাটি শবগন্ধি
নীলাকাশ ছোঁ-মুখ শকুন
কত বদলে গেছ তুমি
তোমার মেঘনায় মৃতদেশ, আর

গঙ্গাগাঙে রক্তে ডাকে বান
কত বদলে গেছ বাংলাদেশ !
সব রাস্তা শরণার্থী'
উদ্‌ভ্রান্ত সকল গতি বুক চাপড়ে হায়-হায় অতি
পরিণতি তবু তীক্ষ্ণ, এক
এ দেখি চোখের জল মুছতে মুছতে শোক ঘৃণা ক্রোধ
ক্রোধ প্রতিহিংসা ধনুর্বাণ
প্রতিহিংসা লক্ষ্যবেধে শুনি বেজে ওঠে জয়
ওঠে জয়
বেজে ওঠে জয় বাংলা জয় !

নবজাতকের জলতরঙ্গ কান্নায়
আ মরি বাংলাভাষা
আমার সোনার বাংলা
আহ্‌, বাংলাদেশ !

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সন্ন্যাসিনী ক্ষমা

সবাই ভোলে ভোলে না শুধু নদী
যদিও তার লতার মত বাঁকা
শরীরে বিষ ঢেলেছে সকলেই
তবু সে ক্ষমা সবুজে লিখে রাখা।

মুখোশে নানা রঙের রেখা আঁকা
পিছনে তার অন্ধকার মুখে
মুখস্থ যে ভয়াল ক্রুর সুখ
নদীর বুকে ফুটছে নিরবধি।

বিস্মরণের মন্ত্র পড়ে যান
সবুজ নারীশরীর আঁটোসাঁটো

নদীর জলে অবগাহন চান
দুজনে হায় যদিও বেমানান।

সময় কিছু এখনো আছে যদি
ভাসিয়ে নাও সন্ন্যাসিনী নদী।

মণীন্দ্র গুপ্ত

প্রার্থনা ও উত্তর

'রেখ মা দাসেরে মনে'—এই ইচ্ছা উত্থিত যেমতি
শুনতে পাই বলছেন তিনি ঃ 'কেন মনে রাখব তোরে বাছা ?
দু-চারটে কবিতা লিখছ বলে তোমাকে কি মনে রাখতে হবে !
শোনো বৎস, ভুল আশা রেখ না কোথাও,
আমি মনে রাখি না কিছুই।'

'সে কি কথা মাতঃ, আমি রাত্রি জেগে খনি খুঁড়ে পালিশ করেছি রত্নরাজি
তারপর সুমুদ্রিত রেখেছি তোমার পদাম্বুজে।—তুমি তাকে গলায় পরবে না ?'

'শোনো বাছা, আরবার বলি, আমি নিই না কিছুই। মুখ্যদল
ঢক্কার নিনাদ করে ; পূজা নয়, কোন্দল জটলা ভরে বারোয়ারীতলা ;
আমি অচিরে সে ব্যভিচারী শব্দপুঞ্জ ঠেলে দিই অশব্দ প্রদেশে।
আর বৎস, তোমার কবিতা ?—জন্মজরামরণের গর্জন চিৎকার কান্না
সেও মুছে দেব। তোর ঐ সুমুদ্রিত, বাসনায় লিপ্ত শ্লোক
পোকাদের আহার করাব। আমি শব ব্যর্থ শব্দ কালের নিঃশব্দ জলে
ঠেলে দিয়ে আকাশ পবিত্র রাখি ;—আমার নির্দয় লোভ
বার বার নতুনের দিকে।
বাছা, মনে রেখ না নিষ্ফল কোনো আশা ।।'

মণীন্দ্র রায়

শীতলাই আমার

তুমি কি রক্তে ভাসো ?
শীতলাই আমার,
তোমার দীঘির পাড়ে, ধানের পাটের
মাঠে মাঠে, বটগাছের সুনীল উদার
আকাশের গায়ে আঁকা ছবিতে, ঘরের
নিকানো উঠোনে, মনে, তুমিও কি আজ
রক্তে ভাসো, শীতলাই আমার !

হিংস্র ওরা, বুনো জানোয়ার ;
চণ্ড ক্রোধে লণ্ডভণ্ড মাটিতে কেমন
জেগে ওঠে জীবনের নতুন ভাঁড়ার
ওরা তা জানে না ; ওরা
সঙিনে বুলেটে প্রতি বুকের ভিতরে
জন্ম দেয় নতুন মানুষ।
একবার জ'ন্মে ওই রক্তস্রোতে তাই,
শীতলাই আমার, আজ বুকে ধরে কালের অঙ্কুশ
আমিও কি আবার জন্মাই !

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

রক্তাক্ত স্মৃতির রৌদ্রে

কল্পিত উৎসব তুমি বন্ধ করে রক্তাক্ত স্মৃতির রৌদ্রে এসে
চেয়ে দ্যাখো মানবতা কিংবা কোনো মানবিক বোধ
কী ভীষণ টাল খাচ্ছে
এই বিংশ শতকের হাঁটুমোড়া প্রতিবেশী সূর্যের সংসারে ;—

কোথায় রাখবে অর্ঘ্য প্রিয়তম রক্তাক্ত পূজার বেদী
সব ফুল
পাপড়িগুলো রক্ত হয়ে গ্যাছে।
কল্পিত উৎসব তুমি বন্ধ করো। রক্তাক্ত স্মৃতির রৌদ্রে এসে
বুকের মধ্যে হাতড়ে দ্যাখো রক্তে ভেজা আধখানা দেশ
অতন্দ্রিলা এই কী ছিলো আমার স্বদেশ !
আমি যে এখন অন্ধকারে বুকের মধ্যে বুক দেখি না ;
অন্ধকারে মুখ দেখি না
বুকের ভূ-ভাগ হাতড়ে দেখি রক্তে ভেজা আধখানা দেশ
অতন্দ্রিলা এই কি ছিলো আমার স্বদেশ !

রণজিৎ দেব

রৌদ্রের ভিখারী

গাভীন গরুর মতো নদীর ওলানে দুধ জমলে
একপাল মাদীমদ্দা বুনো জন্তুর ঝাঁপাঝাপি চৈতন্য
বিলুপ্ত হয় সময় সময়
আকাঙ্ক্ষাহীনতা
অর্থহীন শুকনো পাতার মতো উড়ে যাওয়া সোনালী
মদের দুর্নিবার লালসায় মেতে ওঠা
ছুঁয়ে দেখা মধ্যরাতে সিঁদুর-টিপ গৃহের সন্ধানে,
ধলেশ্বরী কত জল ধরে ?
অবিরল আদরের মতো রৌদ্রের ভিখারী এসে ডুব দিলে
শ্বাসকষ্ট, অশ্রুমতী চোখে, পীড়িত ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে ঃ
জীবন সম্পর্কে গালভরা ব্যাখ্যা চলে না, দধিচীর
মতো আত্মদান
স্বর্গ-নরক বলতে কোন কিছু জানতে চেয়ো না
গাভীন গরুর মতো নদীর
ওলানে যদি দুধ নামে।

রমেশ্বর হাজরা

ভিতরে এসো। ভিতরে

ঘরে এসো। ঘরে এলে খেলা আর খেলা নয়
অথবা সবটাই খেলা। ঘরে এসো
শূন্যের ভিতর দিয়ে ছায়া হাতে ওঠো যেন দর্শকের মধ্য থেকে
উঠছে যাদুকর। এসো
আকুল বাতাস ক্লান্ত পিপাসার্ত শেষ ঘন্টার আওয়াজ, এসো
শূন্যে আর শূন্যের ভিতরে ছায়া ছায়ার ভিতর
আমার প্রাসাদ যেন সকালবেলার হরিয়াল
উড়ে যায় নিজের ছায়াকে নিয়ে যেখানে যন্দুর খুশি যেদিকে যন্দুর
ঘরের ভিতরে তার ছায়া আর ছায়ার ভিতরে শূন্য
শূন্যের ভিতরে খেলা যেন খেলা নয় কিংবা সবটাই খেলা—
ঘরে এসো—ঘরের ভিতরে
যে উড়ে গিয়েছে তার ছায়া…

রবীন সুর

রাজকন্যা

হঠাৎ ভোল্টেজ ড্রপ বৈদ্যুতিক মলিনতা কেন
চোখে চোখে ছায়া ফেলে অস্বস্তির রূঢ় ব্যবহার,
ধমনীর ধারণায় যথাযথ প্রবাহিত রক্তের উত্তাপ
রোমাঞ্চের স্পর্শকাতরতা ভুলে যায় শীত স্রোতে,
গতকাল তারিখের সংবাদপত্রের মতন
নীরেট সংলাপগুলি কৌতূহল ব্যতিরেকে উনুনের গ্রাসে
যেতে চায়। খিটমিটে মেজাজের উত্তর চল্লিশ
রমণীর যৌনহীন সঙ্গমের ধ্বস্তাধ্বস্তি, ক্লেদ
কদাচিৎ আলোকিত আলোড়নে ভ্রূণকে জাগায়।

আকাশ প্রমাণ মেঘ তবু বৃষ্টি খরা প্রত্যাশায়
অতর্কিতে ঝড়ো মেঘ মুহূর্তেই সাফ করে বর্ষণের সাজ ঃ
দ্বিতীয় স্বামীর মত নড়বড়ে কোনো ভালোবাসা
প্রাণপণ খোশামোদে অতিকষ্টে যে-রকম বাঁচে
কবিতা অস্তিত্ব প্রেম ত্রিপিটকে কোনক্রমে জীবনযাপন।

রাম বসু

বদ্ধ ঘরে পাখি ঘোরে

হাওয়া লাগে মুখে
আয়নায় বিব্রত ছায়া
বলিরেখা বিহ্বল আকাশ
ঈশ্বর-প্রতিম মুখ নিরাসক্ত শবের কিনারে

পৃথিবীর নীচে
সমুদ্রের নীচে
পাঁজরের নীচে
কি রয়েছে কিছুই জানো না

খাদানের নীচে আলো ফেলে পা টিপে পা টিপে
যতই হাঁটো না
তোমার সীমানা
বড় জোর তোমার ছায়া-ই

বন্ধ ঘরে পাখি ঘোরে
ঘুরে ঘুরে চক্র গড়ে চক্র ভাঙে
হাওয়া লাগে
ঈশ্বর-প্রতিম মুখে

পিওন রোজই ত' আসে
চিঠিপত্র কিছুই থাকে না

কড়া নাড়ে তবু যেন অভ্যাসের দায়ে
আমার রক্তের ঘোড়া মরে গেছে কবে কোনকালে

দিনরাত
সরাই টেবিল খাট
নিসর্গ হয় না ঘর
দেওয়াল বিধবা

স্থির হলে
মেরুদণ্ড বেয়ে সাপ উঠে আসে মাথার ভিতরে
স্থির হলে
আমার কাঁচের ঘরে অবিশ্রাম বুলেটের গুলি
স্থির হলে
জড়িয়ে শবের গলা পড়ে থাকে সমস্ত ফরমুলা

বন্ধ ঘরে পাখি ঘোরে
ঘুরে ঘুরে চক্র গড়ে। চক্র মোছে…

বন্ধ ঘরে
তোমার নির্মল হাত
আমাকে জড়াতো যদি শিকড়ের মতো

লোকনাথ ভট্টাচার্য

অথবা আধুনিক কায়দায়

কান মুলিয়ে যারা আমায় কবিতা লিখিয়ে নেয়, সেইসব ব্যাঙের-ছাতা পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, আশ্চর্য, তারা কবিতাই পায়—অন্তত আত্মতুষ্টির অভিমান আমার সেই কথা বলে!

কোত্থেকে ঝরে, আশ্চর্য, ফুলের পাপড়ির মতো রেশমী সুবাস, ভিতরের কোন্ কমলালেবুর নির্যাস—যেন প্রস্তুতির মুহূর্তে ওৎ পেতে বসে আছে

সারাক্ষণই, আনাচে-কানাচে জামাকাপড় পরে তৈরী। কল খুললেই জল পড়বে।

তাই আক্ষেপ নেই নিরর্থক নিষ্কর্মা দিনে, যখন বাহাদুর বসন্ত রঙের বিজ্ঞাপনে ফলশ্রুতিতে সোচ্চার, মশমশে জুতো ফেলে পায়চারী করে কারণ জানি তো, এসো তুমি যে-কোন কেউ, ধাক্কা দাও দরজায়, আমি অমনি খিল খুলে তোমাকে আহ্বান করতে প্রস্তুত, আদিগন্ত অন্তরের হাসি-ছোঁওয়া ঠোঁটে॥

চাও যদি বেরিয়ে যাব পথে, হ্যাঁ-গো হ্যাঁ, তোমাকে নিয়েই দুটো কথা বলতে, বা কিছুই না বলতে।

অথবা আধুনিক কায়দার অন্য সেই তুমি যদি হও, না-হয় মর্মান্তিক ঠাট্টায় ছোরাটাই পিঠে চালাও, শেষ হয়ে যাই। তবু তখনো হৃদয়ের থমথমে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থাকবেই দাঁড়িয়ে সারি-সারি কথাগুলো,

কপালে চন্দনের টিপ, হাতে বরমাল্য—যে কথা আত্মীয় মানুষের, মানুষকে ভালোবাসার।

শংকর দাশগুপ্ত

কার কাছে? কার

কার কাছে নতজানু হবো? ভালোবাসার সব সহচরী
প'রে নিয়েছিল ঠিক ছলনার ভীরু নীলাম্বরী

কোন্ জলে তৃষ্ণা মেটাবো? আকাশকে বুকে নিয়ে
শুয়ে আছে ম্লান ধলেশ্বরী

কার কাছে নতজানু? কোন্ জলে তৃষ্ণা মেটানো?

ধলেশ্বরী? নাকি ঐ ছলনার নীলাম্বরী গায়ে
একুশের অমলা ঈশ্বরী

জানু পেতে প্রার্থনায় ভোর হয়ে যাবো
কার কাছে? কার

শঙ্খ ঘোষ

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে

তুমি মাটি ? কিংবা তুমি আমারি স্মৃতির ধূপে ধূপে
কেবল ছড়াও মৃদু গন্ধ আর আর কিছু নও ?
রেখায় রেখায় লুপ্ত মানচিত্র-খণ্ডে চুপি চুপি—
তোমার সত্তাই শুধু অতীতের উদ্দাম উধাও
বাল্যসহচর ! তুমি মাটি নও দেশ নও তুমি।

নদী তুমি ? সে তোমারি শৈবালের আচ্ছাদনে ঢাকা
বেদনার ধারা চলে আসমুদ্র হিমাচল ক্ষীণ—
আমার হৃদয় তার দ্বীপে দ্বীপে পুঞ্জ করে তাকে
খালে বিলে ঘাসে ঘাসে লেখা যেই বিদায়ের গান,
বেদনার সঙ্গী, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি।

তুমি দেশ ? তুমিই অপাপবিদ্ধ স্বর্গাদপি বড়ো ?
জন্মদিন মৃত্যুদিন জীবনের প্রতিদিন বুকে
বরাভয় হাত তোলে দীর্ঘকায় শ্যাম ছায়া-তরু
সেই তুমি ? সেই তুমি বিষাদের স্মৃতি নিয়ে সুখী
মানচিত্র রেখা, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

এই পাওয়াটা

যীশুখ্রীষ্টের হাতের পাতায়
রক্ত ছিল দুই ফোঁটা
বললাম, দাও আশীর্বাদের বদলে।
যীশুখ্রীষ্টের বুকের মধ্যে
রক্ত ছিল এক ফোঁটা
বললাম, দাও ভালবাসার বদলে।

ডানদিকে হেলিয়ে মাথা প্রাগ্ করলেন তিনি
এবং দিয়ে গেলেন।

সেই হোল ভুল।
সেই হোল ভুল মানুষ-নামক আমাদের
বিকল্পে সন্তুষ্ট থাকা—কাগজ-কাটা ফুল।
যা চেয়েছি তাই পেয়েছি—ভালোবাসার বিকল্প
মমত্ববান মানুষ নামে বেঁচে থাকার বিকল্প
তা-ও তো প্রাপ্য নয়, তবু
কিছুই না পাওয়ার চেয়ে এই পাওয়াটা মন্দ কী।

শান্তনু দাস

যেন অষ্টমী পুজোর বাজনা বেজে যায়

কখনো বা মাঝরাতে সমস্ত শরীর জুড়ে
ব্ল্যাক আউট ঃ
বেউল-সরার মতো অন্ধকার বুকে নিয়ে
ভাসতে ভাসতে গহন গেরাম,
প্রাচীন বৃক্ষের গায়ে জরীর চাদর মেলে
নাচানাচি
জোনাকির,
যেন অষ্টমী পুজোর বাজনা বেজে যাচ্ছে সমস্ত শরীরে।
তখনই কে প্রতি রক্তকোষে দেশলাই জেবলে দিয়ে বলে—
কে জাগে হে ?
কে বা জাগে আমার ছায়ায় ?
আমি বলি—আমি বটে, বৃদ্ধ এক সারসের মতো
জলতোড়া পায়ে পায়ে, বিনম্র হাওয়ায়
বাবলার চিরুণি দিয়ে আনি
শব্দ,
ব্রহ্ম,
শব্দ ব্রহ্ম। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে ভূতগ্রস্থ কোনো অনুভব।

তখনি তো পদাবলী, কবিতার মালা হয়ে আসে,
অন্ধকার ছিঁড়ে খুঁড়ে বটের ফলের মতো
জন্ম নেয় আরেক সকাল ।।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এভাবে হয়

এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না
নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে, পাহাড় তাকে সয় না
এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না ।

কীভাবে হয় ? কেমন ক'রে হয় ?
যেমন ক'রে ফুলের কাছে রয়
গন্ধ আর বাতাস দুইজনে···

এভাবে হয়, এমনভাবে হয় ।।

শিবশম্ভু পাল

পঞ্চশীল

তুমি থাকলে তোমার মতো
আমার মতো আমি
অনাক্রমণ চুক্তি হোক
পঞ্চশীল মানি ।

আমি যেন সংকলিত
বিসম্বাদী ভুঁই ঃ
ফণিমনসার পাশাপাশি
স্পর্শকাতর যুঁই ।

আমায় নিয়ে বাউণ্ডুলে
ঘুরি শহরময়
শহর মানে স্বয়ম্বৃত
বিজয়-বিপর্যয় ।

তুমি থাকলে তোমার মতো
গভীর উপবনে
নিষ্ফলতা পড়ে থাকে
গুপ্ত রণাঙ্গনে ।।

শিশির ভট্টাচার্য

তবুও তোমার নামে

দুঃশলা তুমিও থাকো
অনন্তর প্রশ্নের শিহর
মহাভারতের সেই প্রাচীন কবরে ;
হিংসা প্রেম অশ্রু কিংবা
শৌর্য বীর্য কিছু অন্য নয়
কোন প্রহসনে
শুধু এক উচ্চারণ ক্ষীণ
গান্ধারীর স্নেহালু নয়নে
অরব ব্যথিত স্মৃতি কোন এক ভোরে ।

প্রান্তরে অনেক রোদ
বৃষ্টিধোয়া নরম সকাল
ছায়াঘন বন,
মেঘের নীলিম সীমা
ভাষাহীন রক্তিম মুখর
অনেক ঘোষিত আসা যাওয়া
কালের নির্মম চষা মাঠে ।

তবুও তোমার নামে
শব্দহীন ইতিহাস মূক,

জিজ্ঞাসারা আলোড়িত ফেরে
ধ্বনিময় নিমীল আঁধার,
অবান্তর শুধু নাম এক
তুমিও দুঃশলা—।

শিপ্রা ঘোষ

বধ্যভূমিতে খুন

হয়তো অনেক কথা বলা যেতো ঃ তবু
হঠাৎ জলের দরে যৌবন বিকিয়ে গেলে তুমি,
নিস্বতর শরীর, সুখ, স্বাস্থ্য অনুভব বুঝে নিতে
কাছে এলে ঃ তোমাকে বলেনি কেউ ঃ তবু
লক্ষ্য ছিলো জাদুবলে সমস্ত সংযম
ভেঙে দেবে ঃ স্পষ্ট ছায়া দেয়ালের চতুর সংলাপে।
নোতুন গল্পের মতো হৃদয়ে খুশির ঢেউ তুলে
পালক-ঝরানো জলে আলতো আঙুলে মেখে নিয়ে,
দৃশ্যহীন অন্ধকারে ত্রস্ত জনপদ, ভীড়, শীতের সন্ধ্যায় ;
স্বোপার্জিত ভালোবাসা থরে থরে কৌটো ভরা সুখ
সিন্দুকে অসংখ্য মুদ্রা ঃ অতর্কিতে ভাঁড়ারের চাবি
হাতে নিয়ে কাছে আসবে ঃ পলিত জ্যোৎস্নায় সব পাতা
ঝরে গেলে ঃ একা তুমি বিশাল নদীর নীল প্রচণ্ড ব্যথায়,
সমস্ত শরীরে মেঘে, বাগানের কাঁটাতার ডিঙিয়ে হঠাৎ
ভিতরে প্রবেশ করবে ঃ লক্ষ্যস্থির
চিত্র বধ্যভূমি।

সত্য গুহ

চোখ হাজারই দরকার

অহল্যা উন্মাদ হোলো আরো একবার
চাষে উদাসীন কালপুরুষ, জীবনবাদ
শিক্ষার্থী তরুণ, আহা, কী পৌরুষ তার
এতেও সন্ন্যাস লাগবে ? বাতাসে প্রবাদ,

ঘি আগুনের পাশে ঘেমে আসে, নারী,
বন্ধ্যার সতীত্ব, ফুঃ, দুর্নাম প্রচ্ছদ
ঘুচবে না কোনোদিন ? অশ্বিষ্ট বিস্তারী
প্রখর জীবন তেজ ভরা ধানি-মদ
অস্তিত্ব ছাপিয়ে দেয় পাষাণী—উন্মাদ
বালকে ধর্ষণ করে ঋষির রমণী
তপক্লিষ্ট তপ্ত তনু কী অভিসম্পাৎ
দেবে আর, ললাটের লিখন দেখোনি
পাষাণে শস্যের সজ্ঞা উগ্র বলাৎকার
ছাড়া অসম্ভব, চোখ হাজারই দরকার।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সেই গভীর অরণ্যে

সেই গভীর অরণ্যে আরো একবার তোমার ঘুরে বেড়ানো শরীর
দেখা গেল ; শীতের বাটিক রৌদ্র সহরের সূর্য থেকে
স্বচ্ছ হতে হতে অবশেষে অভিভূত বনকেতকীর পাতায়
থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ; এখন সে নিজেই মেধাবী।
তুমি মানুষের প্রিয় প্রতিনিধি ; তোমার দু'চোখে
অনেক গম্বুজ, চূড়ো, বিলডিং রয়েছে
তবু গাছের পাতায় মুছে ফেল চোখ
তাকাও গভীর শিকড়ের দিকে। কথা বলো ঐ
মীনকেতন নদীর সাথে, স্নান কর
সম্পূর্ণ গাহন ; শোনা যায় ধ্যান গাঢ় হলেই কেবল
নেমে আসে গন্ধর্বদুলালী, অসম্ভব স্বাস্থ্য যার
স্বাস্থ্য পায় শ্লোক ; বনের সমস্ত কুমার বৃক্ষের
নাভি থেকে সে সময় ওঠে স্তব, মৌলিক মানুষ
বন থেকে ফিরে টেবিল-ল্যাম্পের নিজস্ব বিজনে
পুনর্বার সংগ্রহশালার হিসাব রচনা করে ; যতক্ষণ না
স্মৃতির ভিতর থেকে উড়ে যায় মাত্র এক, একটিই শালিখ ;
যে শালিখ আজো দুঃখের প্রবাদে অথবা বাস্তবে।

সমরেন্দ্র দাস

দিন—আগামী দিন

ভোর হয়, লাফ মারে সূর্যদেব, শিয়রে দাঁড়ায়
আর আমাদের গোল রুটির দিকে যাত্রা হয় শুরু
থাবা হয় বড়, গ্যাস বেলুনের মত উড়ে যায় মেঘ-বুক পানে
আমাদের প্রিয় মানুষ অপ্রিয় হয়, অপ্রিয় ঘাড়ে রাখে হাত
মানুষের সমাজ, মানুষেরই রক্ত-মাংস চাটে ও চিবোয়
দূর থেকে কেউ কেউ হাততালি ছোঁড়ে—বহুত আচ্ছা, ফির দিখাউঁ
দাঁড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায় আমাদের কাপুরুষ মন···
আবার সহসা, যেন সরে গেলে জল, পড়ে থাকে পলি—কাদা
আমাদের সামনেও আর একটি দিন পড়ে থাকে, দিব্য অবিকল
আহা, ঠিক তারই মতন দিন—আগামী দিন !

সন্তোষকুমার অধিকারী

ভোর আসছে

নদী মানেই ত' চলা।
যা চলছে এবং দু পাশের গাছ, পাথর এবং পাখি
স্বপ্ন হ'য়ে উঠছে বুকে।
মাটির নীরস হতাশাকে ছাড়িয়ে
সবুজ হ'য়ে উঠছে ফসল ;
যা এগিয়ে চলেছে জন্ম দিতে দিতে পৃথিবীকে।

মাঝে মাঝে
তবুও যেন থামতে চায় এই সময়।
যখন ছায়ার মত দেখায় আকাশ,
কিছুই করবার থাকে না বলে।
শীতের কম্বল গায়ে জড়াই
যখন ঘুমিয়ে পড়তে থাকে শব্দ।

যা চলছে না,
এবং অনড় হ'য়ে আছে মনে
যা পাথর হ'য়ে হয় পাহাড়,
যা টানতে থাকে সামনের পথকে পেছনে—
সেই অন্ধকারকে আমি ছাড়াতে চাই।
ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়
জন্ম নিচ্ছে তবু শব্দ
আকাশ হ'য়ে উঠছে লাল
কারণ, আরেকবার ভোর আসছে।

সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার জন্য

তুমিই বল তোমাকে
পেয়েছি কিনা কবিতা
যদি বল 'না'
আমি নতো হবো
নোংরা করবো না
তোমার পুকুর
মরা মাছ হয়ে

চলছে খননের কাজ, চলবে
নিয়ত হবে শব্দ
শব্দ ভাঙার
পাতাল খুঁড়ে আনলে
তোমার প্রতিমা
চিরবাঞ্ছিত আমার
কবিতা

শুধু তোমাকে পাওয়ার জন্য
কাক, বক, চিল বা শামুক
যা বল হবো
মাছরাঙা হয়ে তুলব তোমায়
গভীর জল থেকে
যদি না পাই তবুও নাগাল
শকুনি হয়ে ছিঁড়বো
তোমায়
কিংবা শৃগাল।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

চোখ-আয়না

বৃথা আয়নায় মুখ দেখা
নিজের মুখের ছাপ বিম্বিত হতে দেখো
অন্যের চোখের মুকুরে
উত্তেজনা ভাব পাঠে
জানতে পারবে ঠিক
কোথায় বিরাজ কর
কৈশোর উষায় কিম্বা
উত্তেজিত সূর্যের দুপুরে

দৃষ্টির নদীতে যদি হতে দেখো উত্তেজনাহীন
তাহলে বুঝবে তুমি সন্ধ্যায় পৌঁছে গেছ
পার হয়ে দিন
তোমার প্রতিচ্ছবি জলস্রোতে যেন ঢিল পড়া
নদীতে পড়লে ঢিল সহ্য করে
কয়েকটি বৃত্ত মাত্র আঁকে
চান্দ্র ঘটনা নয় জল ফেঁপে ফুলে ওঠে
চোখের গণ্ডুষে ফুঁসে জোয়ারের বাঁকে।

পুনশ্চ

পুরনো বাড়ীটা একস্তূপ স্মৃতির মতো
পড়ে আছে

পার্কের চেহারা বদলে গিয়েছে

বেথানটা চটা-ওঠা বাসনের মতো
ফাটা জমি ছিল

তার ওপর একস্তর
অনির্বচনীয় ঘাস

ক্ষতের গায়ে প্রলেপের মতো
মরশুমী ফুল

গলিটা নিজের অতীত ভোলবার জন্যে
প্রাণপণ করছে

কিম্বা নিজের পুনঃসজ্জায়
খুশী দেখাতে চাইলেও

আর গলায় কাঁটার মতো বিঁধে থাকবে
একটা পুরণো বাড়ী
থাক, কার্ণিশ
পলেস্তারা-খসা কিছু
চূণ বালি

আর, মাঝে মাঝে মন্থর দুপুর ভ'রে
পায়রার ডাক

একস্তূপ অগোছালো স্মৃতি—
নাড়াচাড়া দিয়ে
যা আবার দাহ
জাগিয়ে তুলবে ।।

সুজাতা প্রিয়ংবদা

হারিয়ে পাওয়া

আজ রাতে
ক্রুদ্ধ সমুদ্র আর উদাস তীরভূমির মাঝে
প্রবল সংঘর্ষ হয়ে গেল ।

উভয়ে কিছু না কিছু হারালো ।

তীরভূমির কর্দমাক্ত বালি ভেসে গেল,
সমুদ্র বমি করলো
কিছু সামুদ্রিক গাছপালা আর শামুক ।

আগামী প্রভাতে আবার সূর্য উঠবে
সৈকতভূমিকে আলিঙ্গন করে উষ্ণতা দিবে
আদর করবে, প্রাণচঞ্চল করবে ।

মাছরাঙার দল আনন্দে শিস্ দিতে দিতে
শিকারের পেছনে ধাওয়া করে
যখন ডুব দিবে সমুদ্রের অথৈ জলে,
তখন
মৃদু মৃদু তরঙ্গ এসে
গা ধুয়ে দিয়ে যাবে
বিস্তীর্ণ সেই বেলাভূমির···

যেখানে বিগত রাতে,
দু'টি হৃদয় এক হ'তে হ'তে
বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ।

একটা গাছের নীচে

একটা গাছের নীচে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকব
আমার ভাবনার মধ্যে
অনেক কালের বিপর্যস্ত দিন
ধুলো সরিয়ে বসার চেষ্টা
তোমারই থাক ।
দরজায় টোকা দিয়ে
আমাকে বিব্রত করার নেশা ছিল
আমি ঘরে ফেরার দিন রেখেছি সরিয়ে ।

একটা গাছের নীচে চিরকাল আমি
দাঁড়িয়ে থাকব ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দেখা হয়নি

নারীকে এখনও ভাল করে দেখা হয়নি
পৃথিবীতে অনেক কাজ বাকি আছে
অনেক যুদ্ধ, অনেক আগুন নিভিয়ে
আলো জ্বালানো
অনেক পথ পেরিয়ে নদীকে খুঁজে পাওয়া
কিন্তু তার আগে এই প্রচণ্ড বাধা
নারীকে এখনও ভালো করে দেখা হয়নি ।

এত চুম্বনেও তেষ্টা মেটে না
এত আলিঙ্গনেও অধরা
এই রহস্যময় প্রাণীটি
বারবার আমার চোখ ফিরিয়ে নেয়

পাহাড় ও সমুদ্রের ছবি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে
তার মাঝখানে এই নারীর রূপ
আমি সূর্যাস্ত ও মধ্যযামকে বদলে দিই
মুখোমুখি দর্পণের মতন সংখ্যাহীন প্রকোষ্ঠ
তার শুরু ও শেষে লুকিয়ে আছো, কে তুমি ?
তোমাকে এখনও একটুও দেখা হয়নি।

সুনীল হাজরা

হাই

সকলেই কিছু কিছু কথা বলে সম্প্রতি সভায়
সভাপতি উপস্থিত, কিছু ভদ্রমহোদয় ফোড়ন কাটেন
সমাজ-সংস্কার ছাড়া সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন
মোটেই সম্ভব নয়, কথাগুলো যেভাবে বলেন ভদ্রলোক,
যেন ক্ষমতা হাতে পেলেই রাতারাতি সব বদলে ফেলবেন
বিক্ষোভ বিদ্রোহ সব এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দেবেন অনায়াসে,
এ কথাটা একবার যদি ভেবে দেখতেন, কথায় ভেজে না চিড়ে ;
এক-সময় কথাগুলি দাঁত বের করে ভেংচি কাটবে, মনে রাখবেন,
কতদিন এইভাবে নিজেকে ঠকাবেন, শুনছেন মশাই—
হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কথা ক'টা ছুঁড়ে মেরে ভিড়েতে মেশেন—
যেন সব আপ্তবাক্য, দর্পণে নিজের মুখ নিজে কী দেখেন !
কে এই উজবুক, বিরক্ত কুঞ্চিত মুখে চোখ দুটো মেলে ধ'রে
কাকে যে খোঁজেন ! চোখ তার বিদ্ধ হলো নিষ্পত্র শাখায়,
ফুল কী ফুটবে গাছে গাছটা কী মৃত্যুর দরজায়
চিন্তাটা ঝলসে ওঠে, বর্তমানে সহ অবস্থানে বাঁচা যায়।
যায় নাকি ? চোখ তুলে চান ভদ্রলোক সভাটা কোথায়
নাকি তার চিন্তার বাগানে হুটহাট কারা ঢুকেছিল সুযোগ সন্ধানে
ভাবনার মগজ ঘুরে এক সময় ক্লান্ত করে প্রতিক্রিয়ার তোলেন ছোট হাই।

তুমি যদি…

তুমি যদি বাহু মেলো
জলের প্রবল চাপ
জলে স্বেচ্ছাচার
নেমে যায়, নেমে আসে আবিল বিন্যাস
নামে ঘৃণা—
শরীরে-চারানো বিষ
ঝ'রে পড়ে, নত হয়
পাপ।

তবুও পড়শীর মুখে ঘুরে-ফিরে কত-কী-না রটে—

তুমি যদি চোখ তোলো
প্রচণ্ড কল্লোলময়
অস্পষ্ট আবেগে ব্যাপ্ত সমস্ত শরীর
স্থির
জলের নিভৃতে যেন
ভোর-ভোর কেমন অপাপবিদ্ধ, পদ্ম হ'য়ে ওঠে।

সুশীল রায়

পিপাসা

প্রচুর তৃষ্ণার সঙ্গে যতবার হয় কোলাকুলি
পিপাসার স্বাদ নিতে, কি আশ্চর্য,
বার বার ভুলি।

আর যার যার সঙ্গে দেখা হয় ঘনিষ্ঠ নিবিড়,
পাইনে তাদের, মনে হয়, উপস্থিতি সশরীর।
অথচ যখন তুমি আস' কাছাকাছি

মউচাকে ঢিল পড়ে ; অকস্মাৎ হয়ে উঠি
মত্ত মউমাছি।

আকণ্ঠ কিসের শুষ্ক অনুভূতি পীড়া দেয় যত,
মনে মনে উচ্চারণ করে চলি প্রার্থনার মত
সখা যদি না'ই হও, সঙ্গী হোয়ো
সর্বদা অন্তত।

কিন্তু মধুচক্র ব'লে যায় পরিচয় ভূ-ভারতে
তাকে পরিহার ক'রে তার আত্মীয়তা পাবে
কোন্ শাস্ত্র মতে ?
তুমি কাছাকাছি আস' যখনি, পিপাসা,
মত্ত যেন না'ই হই, নিবিড় আশ্লেষে পাই
—এই শুধু আশা।
যতদিন তুমি আছ ততদিন আছি,
অতএব থেকো কাছাকাছি ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যত দূরেই যাই

আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা-গাঁথা
এক নদীর নাম—
আমি যত দূরেই যাই।

আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই ॥

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

বিষধরী

যুবতী বিষধরী
নিজের বিষে মরে না ; ক্ষণ আলিঙ্গনে বেঁধে
যাকে সোহাগ ঢেলেছে সেই প্রেমিক শুধু জানে
কেমন করে জীবন পোড়ে সারা জীবন ধরে !

সৈয়দ কওসর জামাল

প্রতিদানে

ভালোবাসা—কতখানি পেলে
হৃদয়ে তরঙ্গ ওঠে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন
স্বপ্নের মধ্যে রাজপথ, ছড়িয়ে যায়
গোলাপী ফুল, অশ্রুসিক্ত চোখে
ঝরে পড়ে সুগোপন ইচ্ছার কয়েক ফোঁটা
ভালোবাসা—কতখানি পেলে তবে
প্রতিদানে ভালোবাসা যায় ?
হয়তো কঠিন হবে শেকল ছেঁড়া
হয়তো ঝলসে যাবে চোখ
অন্ধকারে, অকস্মাৎ আলোর ছটায়
যদিও সহজ ছিল নিঃশব্দে একাকী ভ্রমণ
অথবা একগুচ্ছ ইচ্ছার কুঁড়ি হাতে নিয়ে
কেবলই প্রহর গণনা—এভাবেই সময় গেছে
অথচ সময়ই আবার গর্জে ওঠে তর্জনী তুলে,
শুধু বর্জন নয়—প্রতিদানের দায়িত্বও নিতে হবে।

সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন কী ভীষণ বর্ষা এখন

বর্ষায় মেঘের শরীর বেড়ে গেলে
ঘুলঘুলিতে ঘরের দেয়ালে আনাচে-কানাচে
অন্ধকার ঝুলে থাকে মাকড়সার জালের মতন
অহংকারী নর্দমার লোমশ হাতে নষ্ট হয়ে যায় বারান্দার সুখী স্বভাব।
এখন, কী ভীষণ বর্ষা এখন!

বৃষ্টিতে ভয়েলশাড়ী নষ্ট হবে বলে
মিঠুরা আসে না নির্দিষ্ট জায়গায়
মাঝরাতে বাজের শব্দে শরীরে লোম বেড়ে গেলে
ভয় লাগে নিজেকে নিজেই নিজের গোপন গভীর ক্ষতে
নখ ঢুকিয়ে আঁচড়ে দিই
নিজেকে রক্তাক্ত করে মিঠুদের দেয়া ফটোতে মুখ ঘসি
এখন, কী ভীষণ বর্ষা এখন!

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

অসমাপ্ত প্রতিমা

অসমাপ্ত প্রতিমা আমার দিকে করুণ নয়নে
চেয়ে থাকে। পর্যাপ্ত সময় খুঁজি
যখন নিপুণ তুলি তৈরী হবে বিভোর ঐশ্বর্যে,
নিবের আঁচড় চোখে পরবে কাজল,
মুখে হাসি, ডানা নিয়ে পাখি
উড়ে চলে যাবে গাঢ় নীল নভে।

অসমাপ্ত,
তোমাকে পূর্ণতা দিতে অক্ষমতা মাথা কুটে মরে।

তুমি ভুলে অক্ষমের গৃহে বন্দী
উচ্ছিষ্ট হয়েছ তুমি। মুক্তি নেই।
কোনো যাদুকর এসে মুক্তি দিতে পারে না তোমাকে।

আমার সর্বত্র দীর্ঘ অক্ষমতা,
তীব্র বঞ্চনায়
লাঞ্ছিত তোমাকে নিয়ে
চলে যাবো কোন এক আরো অন্ধকারে।

হরপ্রসাদ মিত্র

এক ফোঁটা কবিতা

খোঁপাতে চাঁপার কলি—কে তুমি, কে তুমি?
এটুকু কবিতা এলো, বাকিটা বকুনি,
সুরে সুরে বিগলিত বচন বিলাস—
এক পেগ মদে যেন সোডা তিন গ্লাস।

বেঘোরে হারালে মতি কে বাঁচাতে পারে?
লিখে না কবিতা যদি বুকের বাঁ-ধারে
তেমন যন্ত্রণা হয়, সেটা হৃদ্‌রোগ।
শব্দের সাধ্যই নয় সারানো সে ভোগ।

খোঁপাতে চাঁপার কলি—কে তুমি, কে তুমি?
এটুকু বক্তব্য; বাকি সবটা বকুনি।

অতীন্দ্রিয় পাঠক

ঠিকানা

অন্ধকারের ঠিকানা থাকে না কে যেন বললো
কে যেন
এখন
দরজা দিলাম বাতাবরণের

শব্দের পর শব্দ তুলে ছেয়ে নিচ্ছি ছাদ
রেখা টানি দেয়াল বারান্দা থেকে দেওয়ালের কোণ
টান টান এই আঁকিবুকি নেশা অন্ধকারে মসৃণ শরীর
এমন শরীর অঝোরে ভাসালে
এই তো ঠিকানা
এই তো
এখন
স্মৃতিগুলো ফিরে আসে বিবর্ণের কাছ থেকে মুক্তি
পেয়ে। শালবনের ঐশ্বর্য দিয়েছিলো তারা। সমুদ্রের
ঢেউ খাল কেটে ঘরে এনে পৌঁছে দেবার পর
পাল তুলে হাওয়া কেটে কালো রঙের ওরা। যারা
বাইরে গ্রীষ্মের রোদ মেখে গাছের নীচে গায়ে ছায়া
মেখে প্রতীক্ষা করে। যখন সবাই ফিরে
নিঃশব্দে এসে
ছড়ানো শব্দের কাছে নিঃশব্দের খোঁজ
বরং এখন
কলংকিত ছাদ উড়ে যাক শব্দেরা ফুলের মত ঝরুক
বাতাবরণ দরজা ভেসে যাক হাওয়া দুলুক
আঁকি বুকি মেলা এই দেওয়ালের কোণ বেঁকে যাক
অন্ধকার থাক
থাক আমার ঠিকানা
এই অন্ধকারে।

বিদেশী কবিতা ঃ

নেপালী

মাধবপ্রসাদ ঘিমিরে

[অগ্রজ নেপালী কবিদের অন্যতম মাধব প্রসাদ। সম-সাময়িক প্রখ্যাত কবি লেখনাথ, সিদ্ধিচরণ ও দেওকোটার সঙ্গে এক আসনে বসার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'গৌরী', 'পাপিনী আমা' এবং 'কিশোরী' নেপালী কবিতার ক্ষেত্রে অতুলনীয় সৃষ্টিরূপে আদৃত। প্রধানত কোমল ও করুণ রসের প্রতিই তাঁর আসক্তি। অপ্সরা নেপালী কবিতার বাণিক ধারার রচনা হিসেবে পরিচিত ও সমাদৃত।]

অপ্সরা

আকাশে উড়তে উড়তে ক্লান্ত আমার মন
পথের শেষ নেই।
আমি মাটির পৃথিবীতে বিশ্রাম নিতে চাই
আপন খেয়াল-খুশিতে চলে ফিরে বেড়াতে চাই।

জানি স্বর্গে চিরবসন্ত, চির সৌন্দর্য—
মাটির পৃথিবীতে শীত বসন্ত শরৎ হেমন্ত
দেখতে পাব।
উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় পথ রুদ্ধ করে
কোমল অন্ধকারে ঘুমাতে চাই।
ভোরের আলোয় চোখ মেলে
তাকাতে চাই।

এখানে মুহূর্তে অমৃত পাই
অমৃতে আমার অরুচি।
আমি চাই তৃষ্ণায় সুপেয় জল
ক্ষুধায় খাদ্য।
স্বর্গের অফুরন্ত আনন্দে আমার প্রয়োজন নেই।
আমি দুঃখীর চোখের জল মোছাতে চাই।
তাদের সেবায় কাল কাটাতে চাই।

দেবতার চোখে আমি শুধু সুন্দরী নর্তকী
রূপ যৌবনবতী।
মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই পেতে চাই
গৃহলক্ষ্মীরূপে।
আমার তৃষ্ণা মিটেছে।
দেবতার সোহাগ আদর মিলন আমার
ভাল লাগে না।
আমি প্রবাসী নায়িকার মত
বিরহিণী হয়ে
প্রিয়জন চিন্তায় কাল কাটাতে চাই।

আমার এ বন্ধ্যা যৌবন আমি চাই না।
আমি চাই ফুলে-ফলে প্রস্ফুটিত হতে
বিকশিত হতে,
নিজেকে উজাড় করে দিতে।
সন্তানকে স্তন্যদান করে বৃদ্ধা হওয়া ভাল।

কারো তপস্যা ভাঙার সাধ নেই আর,
এখন থেকে ভাঙা মন জুড়ে দেব
ভাঙাঘর গড়ে তুলব।
স্বর্গে আছে রঙ্গরস, মাতাল যৌবন
ফুলের বাহার।

পৃথিবীতে কাঁটার জ্বালা, চড়াই উৎরাই।
পৃথিবীতে দেবতা নেন অপরের সেবা।
মানুষ চায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে
অপরের সেবা করতে।

স্বর্গের এই বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপনে
আমি ক্লান্ত,
আমি নিঃস্ব
আমি রিক্ত।
আমি হাসিমুখে মাটির পৃথিবীতে
মৃত্যুবরণ করতে চাই।
আমার মৃত্যুতে অপরের চোখের
জল ঝরবে।
আমি সেই মর্ত্যের জীবন চাই,
অমর যৌবনবতী সুন্দরী নর্তকী
জীবনে আমার বিতৃষ্ণা।

অপ্সরা জ্যোতির পাখা খুলে
এই কথা বলল।
তার স্বর্গবাসের দিন শেষ।
এবার তার নবীন জীবন,
মর্ত্য জীবন সুরু।

অনুবাদ : হরেন ঘোষ

আমেরিকা

ওয়ালেস স্টিভেনস

[বিশিষ্ট আমেরিকান কবি ওয়ালেস স্টিভেনস (১৮৭৯—১৯৫৫) ছিলেন পেশায় উকিল। ওকালতি পড়ার সময়ে একটি পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে স্টিভেনস কবিতার জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর কবিতা নিখুঁতভাবে সৌন্দর্যপূর্ণ যা প্রতীকি অভিব্যক্তিতে সৃজনশীল ও অনুভবনশীল এবং সেই সব কবিতা আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যকে নানাভাবে উর্বর করেছে।]

তুষার মানব

একজন পেয়েই যায় ঠিকঠাক শীতের স্মৃতিমালা,
তাকিয়ে দ্যাখা শীতের হিম আর তুষারের সরে ঢাকা
পাইন গাছের পল্লব ;
এবং অনেকটা সময় জুড়ে পাওয়া হিমের পরশ
বরফ জমা চিরহরিৎ গুল্মের প্রতি দৃষ্টিপাত ইত্যাদি।

জানুয়ারী মাসের রোদ্দুরে,
বাতাসের শব্দে নেই কোনো দুঃখের ভাবনা
কয়েকটি পাতার শব্দে সেই সব ভাবনা
যা শুধুই মৃত্তিকার শব্দ—
একই বাতাসের পূর্ণতা
বাতাস বয়ে যায় সেই একই প্রকাশ্য মাটির উপরে।

সেই শ্রোতাটির জন্যে, সে শুনে যায় তুষারপাতের মধ্যেও
এবং সে দ্যাখে—কিছুই নেই তার
সে দ্যাখে না যা, সে সব কিছুই নয়।

অনুবাদ ঃ অভিজিৎ সিরাজ

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে ঃ

মারাঠী

নামদেব ধাসাল

[ষাট-এর দশকের 'দলিত পানথারে'র কলমে মারাঠি বিপ্লবী কবিতার উদ্বোধন ঘটলো। অনুন্নত তথা আদিবাসীদের জীবনে সীমাহীন বঞ্চনাকে উপজীব্য কোরে গড়ে উঠলে এই বিপ্লবী কবিতাশৈলী। এই কবিতাটি বিপ্লবী কবি নামদেব ধাসালের একটি কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।]

এখানে সকল ঋতু

এখানে এমন মরসুমী নিষ্ঠুরতা
কিংবা বিলম্বিত মৃত্যুর কংকাল
শাখা বিশাখায়

এখানে চোখের পাতায় রোমশ বিষণ্ণতা
এখনো মগ্নতা ঝরে চোখের পাতায়
এবং চোখের মগ্নতা ভাষা পায় পাথরের বুকে

এখানে অঢেল কৃপণতা
অনেক আশার কাঁচ স্বচ্ছ হ'য়ে বাঁচে

বুকের গভীরে জ্বলে
সৃষ্টির উৎস হতে কালিমা বলয়ে

এখনো মহামগ্ন বোম্বেটে ছোঁয়ায়
হৃদয়ে-জীবনে সুর কিছু ভোলাবার

জীবন এনেছে যেন মানুষ-মানুষে খায়
ভালিয়ার পিঠে নিস্তব্ধ গোপনতায়
চাবুকের রক্তাক্ত দাগে।

অনুবাদ ঃ দিব্যেন্দু মিত্র

সোহন সিং

[কর্ণেল সোহন সিং ভারতীয় সোনাবাহিনীতে কর্মরত। চৈনিক আক্রমণের সময় লাদাকে তাঁর এক বন্ধুর মৃত্যুকে নিয়ে এই কবিতা]

প্রিয় ফুল

প্রিয়তম, যুদ্ধনিষ্ঠ গ্রামীণ রবি
বিবিধ বিচিত্র রণসাজে
গাহ গান সীমান্তের অন্তিম প্রহরী
অমৃত অশোক বাণী বহিছে শিরে
ভারত আত্মার সেবায় নিজেরে
রেখেছ ঘিরে সীমাহীন
বেদনার পরে
বরণীয় প্রিয়জন
স্বাদশ ছবির মৃন্ময় আশীর্বাদ
দেশের সেবায় আনত শিরে
আমারে করেছ মহান
দূরে দূরান্তরে
মঙ্গলশাঁখ বাজে
কোলাহলে আজ সব ভুলে
দুঃখ-তাপের ছায়া
আজ তুমি নাই
স্মৃতি রয়ে গেছে বায়ে
সব ভুলে যাই
বিরহের গোপনতায়
বীরের ছায়ায়
করি প্রণিপাত আদি
বসুন্ধরা বরে তুমি জেনো শুধু
ধরণীর অধিপতি ।।

অনুবাদ : সুমর জোয়ারদার

কবিতা সময়কে সহজ করার অন্যতম সঙ্গী। কিন্তু আজ যেখানে পাঠক খুঁজছেন একটি কবিতাকে, কোন কবি নেই সেখানে। এমন সময়ে পাঠকের কোন কবিতাই পছন্দ হচ্ছে না। ঠিক এ রকম সময়ে 'অন্তহীন দৃষ্টির উৎসব' পড়লাম। আমি চমৎকৃত। শ্রীভৌমিকের অন্য কোন কাব্যগ্রন্থ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি পড়তে পারিনি। তবে পত্র-পত্রিকায় উনার কিছু লেখা পূর্বেই চোখে পড়েছিলো, সে সূত্রে উনি আমার চেনা।

এ গ্রন্থের একটুকরো ভূমিকা দিয়েছেন শ্রীজয়ন্ত কুমার। এইটা একটু অন্যভাষায় শ্রীভৌমিকের লেখা হলে ভালো হতো। তবে কাব্যগ্রন্থের ভূমিকার কি কোন প্রয়োজন আছে? আমার তো মনে হয় কবিতা-ই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা। শ্রীজয়ন্ত কুমারের বিজ্ঞাপন-সদৃশ ভূমিকা না ছাপলে বইটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতো আরো বেশী।

কবিতা সম্পর্কে এ গ্রন্থের কবির বক্তব্য—'কবিতা জীবনের সুন্দরতম আর্তনাদ।' আর্তনাদ কখনো সুন্দর হয়? সেটা সর্বকালে সর্বদেশে সভ্য সমাজের কলঙ্ক। কবিতা আর্তনাদ হতে যাবে কোন্ দুঃখে? ভূমিকার এ রকম অসুন্দর উক্তি বড্ড পীড়া দেয়।

রচনাশৈলী, শব্দ-প্রয়োগ, নতুনতর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা এ গ্রন্থের কবিতাবলীকে সুন্দর করে তুলেছে। তবে দু'চারটে কবিতা পড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়েছি। গালে টোল পড়েছে। দু'একটা কবিতা কবি যেখানে শেষ করেছেন সেখানে শেষ না হয়ে আরো একটু এগিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা রাখে। কিছু কিছু শব্দ উচ্ছেদ এবং কিছু কিছু শব্দ পাল্টে দিলে কবিতাগুলো আরো সুন্দর হতো বলে মনে হয়। দু'একটা ক্ষীণতম উদাহরণ দিই। 'অনন্ত ও সীমা' কবিতায় 'দেশহীন দেশে' কেন যে কবি লিখলেন বোঝা গেলো না। তেমনি 'নর্তকী না বলছে আজ' কবিতায় 'রাজা' শব্দটা চতুর্থ লাইন থেকে বিদায় নিলে কবিতাটা সুখপাঠ্য হতো বলে মনে হয়। এভাবে প্রায় প্রত্যেক কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা কবিতাগুলো পড়তে পড়তে আমাকে বেশ কয়েকবার পূর্বের এক নগরী থেকে ঘুরে আসতে হয়েছে। অসম্ভব কবিতু-শক্তি থাকা সত্ত্বেও একটু যত্নশীল হওয়ার অভাব সমস্ত গ্রন্থ জুড়ে পীড়াদায়ক হয়ে ভেসে উঠেছে।

একজন কবি সারাজীবন ধরে অজস্র কবিতা লিখেন। সেই অজস্র কবিতার মধ্যে থেকে উঠে আসে দু'একটি কবিতা যা কবিকে বাঁচিয়ে রাখে। এ গ্রন্থে শ্রীভৌমিক কখনো কোন শব্দে, কখনো কোন বাক্যে, কখনো কোন চিন্তায় চিরদিনের হয়ে থাকবেন। আমি নিঃসন্দেহ। গ্রন্থের প্রচ্ছদ সুন্দর, বাঁধাই রুচিশীল, ছাপার ভুল অজস্র।

—কঙ্কন নন্দী

'অন্তহীন দৃষ্টির উৎসব'। গৌরাঙ্গ ভৌমিক। দে বুক স্টোর। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

২

বিপ্লব চন্দ-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্রের মলাট'। সাদামাটা প্রচ্ছদে দুই মলাটের মধ্যে আঁটিয়েছেন অজস্র কবিতা। যদিও বেশির ভাগ কবিতাই অণু। কয়েকটা আবার আকারে পরমাণু কবিতার সঙ্গে বড় কবিতাও রেখেছে।

ব্যাক কভারে ছবিসহ ভূমিকায় বলেছেন—"কাব্যগ্রন্থে প্রচলিত আঙ্গিকের দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন। আগুনের মতো শব্দ ব্যবহারের অপূর্ব কৌশল। স্বকীয়তায় প্রমাণ করে তিনি একজন শক্তিমান কবি"—এই সত্যটা বিপ্লব চন্দের 'রৌদ্রের মলাট' পড়ার পর প্রত্যেক পাঠককেই মানতে হবে। নিজস্ব ঢং নিয়ে কবিতাগুলো গড়ে উঠেছে।

বিপ্লবের ছোট কবিতাগুলিতে ছন্দের কাজ বেশ ভাল লাগে।

এমনি আরো কয়েকটা ছোট কবিতা রয়েছে এই গ্রন্থে। যদিও আমার এই কবিতাগুলো পরিণত কবিতা মনে হয়নি। কিন্তু অন্য কবিতাগুলি বেশ বলিষ্ঠ ও অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে।

'আমি ভালবাসি' এমনি আরো অনেক অনেক ভাল কবিতা রয়েছে উল্লেখ করার মত। মলয়শংকর দাশগুপ্তের মলাটের কাজ ভাল। ছাপা চলনসই।

—চিত্রভানু সরকার

'রৌদ্রের মলাট'। বিপ্লব চন্দ। মণি প্রকাশনী। ৩৯বি, ডেন্টমিশন রোড, কলকাতা-২৩।

বর্ধমান

[সারা জেলায় অধুনা কবিতাচর্চা করে চলেছেন অনেকেই। এই স্বল্প অবয়বে তাঁদের সার্বিক পরিচয় দেওয়া যায় না। যাঁরা কোনো-না-কোনোভাবে পরিচয়ের আওতায় এসেছেন, তাঁদেরও আংশিক পরিচিতি দেওয়া গেল।]

প্রফুল্ল অধিকারী—আসানসোলের এই কবি কবিতা লিখছেন চল্লিশের শেষ থেকে। সহজ সরল গদ্যভংগীর কবিতা। প্রথম জীবনে গ্রামীণ মানুষ, তাঁর সুখ-দুঃখের কথা, পরবর্তী জীবনে নগর-জীবনের জটিল আবর্তে খিন্ন গণচেতনাকে উজ্জীবিত করায় ব্যাপৃত রাখলেন তাঁর কবিতাকে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'ধূসর শতাব্দীর কবিতা' ও 'নগ্ন নক্ষত্রের নীচে'।

তারক সেন—চল্লিশ-পঞ্চাশের দুর্ধর্ষ কবি। বার্ণপুরের অধিবাসী। বাংলার প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। এখন কলম থেমে গেছে।

সুনীলেন্দুপ্রকাশ রায়—বাস আসানসোলে। চল্লিশ-পঞ্চাশে এমন কি ষাটেও লিখেছেন। এখন লেখেন না। কাব্যগ্রন্থ : 'স্বর্ণকূট'।

আবদুল গণিখান—বর্ধমানে থাকেন। সত্তর ছুঁইছুঁই বয়স। পুরণো রীতিতেই লেখেন। এখন কম। কাব্যগ্রন্থ : 'মাটির সুর,' 'ফেরারী'।

আনোয়ার হোসেন—বর্ধমানের এই পল্লীকবির রচনায় অনেকাংশে কুমুদরঞ্জনের ছোঁওয়া। এখন লেখেন কম। কাব্য : 'কেয়া ও দেয়া'।

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়—চিত্তরঞ্জনের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন কাব্যচর্চার সাথে সাথে নাটকেও জড়িয়ে রয়েছেন। কাব্য : 'সোনালী ডানার চিল,' 'সমুদ্রের দিকে', 'আমি একা এবং সে', 'এইসব হার্দ প্রেম রক্ত ধূলিকণা', 'মাঠ পাথারের গান' এবং 'আলোকিত ইচ্ছার তরীগুলি (তিনজন কবির সঙ্গে)।

জীবেন্দ্র সিংহরায়—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগীয় প্রধান। ডঃ সিংহরায় বুঝি কবিতার প্রাণকেন্দ্রে বসবাস করতে চান। সময়-অসময়ের কোনো প্রতীক্ষা না করেই তাই আমাদের উপহার দিয়ে চলেছেন তাঁর হৃদয়-কুসুম।

সুনীল সেন—পঞ্চাশের কবি। কুলটীতে থাকেন। যে-কোনো সাধারণ ঘটনার মধ্যেও আশ্চর্য সৌন্দর্যসন্ধানী। আত্মমগ্ন।

অসীমকৃষ্ণ দত্ত—পঞ্চাশের পরিচিত কবি। এখন সামান্যই লেখেন। আসানসোলের কবিতা-পত্র 'কবিকর্ম' (অধুনালুপ্ত) সম্পাদনা করতেন। কাব্য ঃ 'একটি প্রহর', 'ও 'তোর ঘরের ঠিকানা'।

কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়—বর্ধমানের এই কবি পঞ্চাশে লেখা আরম্ভ করেন। এখন কিছু বাংলা কবিতার অনুবাদে ব্যস্ত। কাব্য ঃ 'আমাদের এইসব দিন'।

চিত্ত ভট্টাচার্য—বাসস্থান বর্ধমান। পঞ্চাশ-ষাটে লিখতেন। এখন কম। কাব্য ঃ 'পত্ররাগ' ও 'ঝরণাতলার নির্জনে'।

অলোক রায়—শ্যামসুন্দর কলেজের অধ্যাপক। দীর্ঘদিন লিখছেন। পরিচিত কবি।

পংকজ সিংহ—'অন্যদিনে'র বর্ধমান জেলা সম্পাদক। 'সান্ধিক' পত্রিকার সম্পাদক ঃ বহু পত্র-পত্রিকায় কবিতা লেখেন।

উদয়ন ঘোষ—আসানসোল, বি, বি, কলেজের অধ্যাপক। গদ্যেই এঁর বসবাস। কখন-সখন কবিতা (ইনি পদ্য বলেন) লেখেন।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রাণীগঞ্জ টি, ডি, বি, কলেজে অধ্যাপনা করেন। পঞ্চাশের কবি। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'শালবন' ও 'নিহত প্রতিমাগুলি'।

বাদল ভট্টাচার্য—দুর্গাপুরের এই কবি ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতী হয়েও আধুনিক। যেহেতু তিনি শিল্পী তাই তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প বেশী স্থান পায়—এবং তারা যেন সবাক আর তাতে সংগীতধ্বনি স্ফুরিত হয়। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'অনন্ত মধ্যাহ্নে ফিরি'।

দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়—কুলটিতে থাকেন। দীর্ঘদিন লিখছেন। অর্ন্তমুখী হৃদয়ের ব্যাপ্তি তাঁর কবিতায়। কম লেখেন।

অনিলকুমার মোদক—মেমারীর অধিবাসী। ইদানিং কম লিখছেন। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'রক্তে রোদ্রে ও অভীপ্সায়'।

মতি মুখোপাধ্যায়—কুলটীর বাসিন্দা। পঞ্চাশের মাঝামাঝি কবিতা লিখতে শুরু করেন। মানুষ এবং তার বিষয়-আশয় তাঁর কবিতার উপজীব্য। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সর্বজনে প্রসারিত করায় প্রয়াসী। কাব্য ঃ 'সন্ধ্যার জানালা' ও 'অর্জুন সময়'।

মধু চট্টোপাধ্যায়—দুর্গাপুরের অধিবাসী। বেশ কিছুদিন লিখছেন। ষাটের গোড়ায় কবিতা শুরু। মানুষের পীড়ন-শোষণের বিরুদ্ধে নিজস্ব বিশ্বাসে Satire লিখে চলেছেন।

আবদুস সামাদ—রাণীগঞ্জ টি, ডি, বি কলেজের অধ্যাপক। 'জন্ম রোমান্টিক' হলেও ইদানীং কবির রচনায় উপমা-চিত্রকল্পে তীব্র সমাজচেতনার প্রকাশ ঘটছে।

আনীশ কল্যাণ—দুর্গাপুরের 'লোকায়ত' কবিতা পত্রের সম্পাদক। কাব্য ঃ 'নসটালজিয়া', 'জেলখানার দিনগুলি' ও 'বিষুবরেখার লম্বভাবে'।

সুব্রত চক্রবর্তী—বর্ধমানে থাকেন। কলেজে অধ্যাপনা করেন। স্বচ্ছল কবিতা লেখেন। আগের কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর পরিচিত কবি। কাব্য ঃ 'বিবিজান ও অন্যান্য কবিতা'।

প্রফুল্ল মিশ্র—আসানসোল জন্মস্থান। ষাট থেকে লিখছেন। কম লেখেন। সামাজিক যন্ত্রণার কথাই তাঁর কবিতায় বেশি লক্ষিত হয়। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'বন্ধু এখন'। 'বিকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা করে চলেছেন।

প্রদীপ দাশশর্মা—আসানসোলের বাসিন্দা। কলেজ-অধ্যাপক। ষাট থেকে লিখছেন। চমৎকার লিখছেন। অধুনা তাঁর একটি কাব্যনাট্য প্রকাশের অপেক্ষায়।

হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়—কর্মসূত্রে ডিসেরগড়ে। ষাটের গোড়ায় লেখা শুরু। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'রোদ জল ঝড়ের সময়'।

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়—বাসস্থান দুর্গাপুর। বেশ কিছুদিন লিখছেন। কাব্যগ্রন্থ : 'শরিক না হলে'।

মণীন্দ্র চক্রবর্তী—আসানসোলের এই কবি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে ছড়াও লিখছেন। তেজি কবিতা লেখেন।

ভোলানাথ ভট্টাচার্য—আসানসোলে বসবাস। লিখছেন ষাটের গোড়া থেকেই। শান্ত অথচ জেদী প্রকৃতির। নিজস্ব চিন্তাশক্তি দিয়ে সমস্যাবলীর বিচার-বিশ্লেষণে আগ্রহী।

সমরেশ দাশগুপ্ত—আসানসোলের এই কবি মূলতঃ গল্পকার। ইদানীং সাত-আট বছর ধরে কবিতা লিখছেন।

অজিত সরকার—আসানসোলের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন কবিতা লিখছেন। গণচেতনার কবি।

বরুণ বিশ্বাস—বার্ণপুরের বাসিন্দা এই সুপরিচিত গীতিকার (রেকর্ড ও রেডিও) ও কবি (একদা ক্ষুধার্ত প্রজন্মের দুর্ধর্ষ রচয়িতা) মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন।

নন্দদুলাল আচার্য—ডিসেরগড়ে জন্ম। মানুষের সুখ-দুখের সঙ্গী হতে চান এই কবি তাঁর কবিতার মাধ্যমে। কাব্যগ্রন্থ : 'বৃক্ষের নির্জনে নদী'।

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়—আসানসোলের এই কবি কবিতা শুরু করেন পঞ্চাশের শেষ দিকে। গণচেতনার কবি। কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব দেখা যায়।

মৃণাল বণিক—দুর্গাপুরের কবির লেখায় প্রেম-প্রকৃতি নিবিড়ভাবে থেকে যায়।

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়—রোমান্টিক কাব্যভাবনার অধিকারী এই কবি থাকেন দুর্গাপুরে। কাব্যগ্রন্থ : 'সুখের নাম অসুখ'।

অরূপ গঙ্গোপাধ্যায়—কাব্যভাবনায় মানুষের সামাজিক সংকটের কথা তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়। মাঝে মাঝে ভালো কবিতা উপহার দেন। বয়সে এখনো ছাত্র-ছাত্র ঘ্রাণ। আসানসোলে থাকেন।

নীতিশ চৌধুরী—ঠিক একই প্রকার ঘ্রাণ নিয়ে যাকে আমাদের ভালো লাগে। কুলটিতে থাকেন। মাঝে মাঝে আশ্চর্য সুন্দর কবিতায় চমকে দেন। সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'হিরণ্য বিষাদ'।

দিলীপ পাত্র—আসানসোলের এই কবি যুগপৎ রোম্যান্টিক ও সংগ্রামী লেখায় পারদর্শী। কম লেখেন। সুন্দর লেখেন।

হর্ষদেব মুখোপাধ্যায়—আসানসোলের বাসিন্দা। গণচেতনার সংগ্রামী কবি।

সুনীলবিকাশ পাল—আসানসোলের এই চিকিৎসক-কবি ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের খুঁটিনাটি বিচারসহ মননে কবিতাকে সাজাতে বেশি ভালোবাসেন।

বিধু বাউরী—সমকালের দ্বিচারিতায় ক্রুদ্ধ এবং অসহিষ্ণু। খামখেয়ালী। আসানসোলে বসবাস।

নীহার বাগ—বর্ধমানের বাসিন্দা। যুক্তিতর্কে স্থিতপ্রজ্ঞ এই তরুণ কবি ভালো ভালো কবিতা উপহার দিয়ে যাচ্ছেন।

শক্তি হাজরা—বর্ধমানের অধিবাসী। নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামে সহযোগী এই কবি স্বচ্ছল কবিতা লেখেন। তবে কম।

বিমলেন্দু দত্ত—প্রগতিশীলতার স্বাক্ষর রাখতে আগ্রহী তাঁর কবিতায়। কাটোয়ায় বসবাস।

দীপঙ্কর ঘোষ—কাটোয়ার বাসিন্দা। ভালো লেখেন।

এ ছাড়া আরো অনেকেই কবিতার রাজ্যে বিচরণে সুপ্রয়াসিত রয়েছেন। এঁরা হলেন বিপ্রদাস ভট্টাচার্য, ধীরেন দেব, নন্দ চৌধুরী, ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত ঘাঁটি, রামানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রমেন ভট্টাচার্য, সোমেশ দাস, দিলীপ সরকার, দিলীপ দত্ত, সলিল সেন, গোপাল কুম্ভকার, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত বিশ্বাস, অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণব সেনগুপ্ত, হারাধন সোম, দেবাশিস সোম, শিপ্রা মুখোপাধ্যায়, বামাপদ সরকার, বিশ্বদেব ভট্টাচার্য, অসীম মুখোপাধ্যায়,

গুরু রায়, শম্ভু মিত্র, প্রতিম সরকার, বিমান ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ দেব, শংকর চক্রবর্তী, স্নাতকোত্তর পাল, রক্ষাকর পাল, বিকাশ পাল, দীপেন মুনসী, সমর চন্দ, নারায়ণ বিশ্বাস, লক্ষ্মী আদিত্য, রতনলাল দত্ত, নীলা কর, তারকেশ্বর চট্টরাজ, সুকুমার রায়, বিনয় রায়, অজয় পাত্র, নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল ঠাকুর, প্রণব ঘোষ, দিলীপ সাহা, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন ভট্টাচার্য, অষ্টাবক্র রক্ষিত, নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর দীক্ষিত, প্রবীর সান্যাল, প্রবীর মিত্র, গোপীনাথ ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়, সীতারাম উপাধ্যায়, অরবিন্দ দাশগুপ্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, স্বাগতা ভৌমিক, মায়া মুখোপাধ্যায়, প্রবীর ভট্টাচার্য, নিরংকুশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানুপ্রিয় চট্টরাজ, মণি মৈত্র, শ্যামাপদ প্রামাণিক, দিলীপ মুখার্জী প্রমুখ।

স্বল্প অবকাশে সামান্য কথায়, শুধু নামোল্লেখ করে ঠিক পরিচিতি দেওয়া যায় না! তবু চেষ্টা করা গেল এই ভেবে যে, অনেক কবিই জন-চক্ষুর তথা জ্ঞানের আড়ালে যাতে পুরোপুরি না থাকতে পারেন। হয়তো অনেকেরই নামোল্লেখ করা গেল না। এজন্য দুঃখিত। তবে আশা করবো, যাঁরা এই দরিদ্র পরিচিতির আওতায় এসেছেন তাঁরা যেন পত্রিকার দপ্তরে যোগাযোগ রাখেন। তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন। কবিতার অগ্রগতি তথা প্রচার একান্তভাবেই কামনা করি।

অমিতাভ সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২রা জানুয়ারী রবিবার দক্ষিণ কলকাতার জোনাকী উদ্যানে অমিতাভ সাহিত্য পত্রিকা একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক সকাল প্রতিপালিত করে। এতে আধুনিক কবিতার গীতিরূপ গেয়ে শোনান ঋষিণ মিত্র। কবিতা পাঠ করেন তাপস ওঝা, ফটিক চৌধুরী প্রমুখ। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ইন্দু রক্ষিত, দেবাশিস সেনগুপ্ত প্রভৃতিরা।

বিম্বন পত্রিকার সাহিত্য সম্মেলন

তখন কাকদের কনফারেন্স বসেছিল গাছে, এক বসন্ত বিকেল, ২৭শে মার্চ ১৯৭৭, গল্পকার জীবন সরকারের মধ্য কলকাতার বাড়ীর ছাতে হঠাৎ বিনা নোটিশে বসে গেল এক ঘরোয়া সাহিত্য সম্মেলন। সেই রবিবারের বিকেলে কবিতা ও গল্পপাঠে জমে উঠল আসর ; বিম্বন পত্রিকার আহ্বানে ভ্রাম্যমান এরূপ অনুষ্ঠান শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় প্রায়ই শুরু হয়ে যায়। ক্রমশঃ কবিতাপাঠ এগিয়ে চলল, মৃদু, শীতল, উচ্চ ও গরম সুরে কবিতা পড়ে চললেন, মলয় গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়, নিমাই মুখোপাধ্যায়, সলিল চক্রবর্তী, মিঠু মুখোপাধ্যায়, সবিতা মজুমদার, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, অসীম চট্টোপাধ্যায়, পার্থ সরকার, পরম ক্ষত্রিয়, নরনারায়ণ, পুততুন্ড, তাপস ওঝা, পূর্ণেন্দুশেখর, পন্ডিত অমিত কাশ্যপ, অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনাকী ঠাকুর। অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতা, এনে দিচ্ছিল আশ্চর্য লোকের সুর, তিনবার পঠিত হল সবার অনুরোধে। কবিতার ফাঁকে ফাঁকে গল্প পাঠ করলেন তপন চট্টোপাধ্যায়, সাজাহান সিরাজ ও অধীর বিশ্বাস। অধীরের সাংঘাতিক গল্পটি প্রশংসা পেল সমস্ত শ্রোতার। পঠিত কবিতা ও গল্প নিয়ে আলোচনা করলেন শতদল দত্ত, সৈয়দ কওসর জামাল ও জীবন সরকার।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল প্রথা নিয়মে, ছাত সংলগ্ন গাছের কাকগুলি উড়ে গেল এদিক-সেদিক, চা এল। চা এবং টা সহযোগে আড্ডা শুরু হলো অন্ধকার ছাতে। প্রদীপ মুখোপাধ্যায় শুরু করলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। সেদিন তাঁর ভরাট ও মায়াময় কণ্ঠের সুরে, সেই অন্ধকার অনুষঙ্গে, কয়েক মিনিটের জন্য হলেও অন্য জগৎ ধরা দিয়েছিল।

INDIAN TUBE

THE INDIAN TUBE COMPANY LIMITED

A TATA-STEWARTS AND LLOYDS ENTERPRISE

Manufacturers of
Tubes and Strip in India.

ITC-11B